Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:গোলে জান্নাত ফেরদৌসী

রোলঃ ২৩১০০১২০০৮৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:গোলে জান্নাত ফেরদৌসী

রোলঃ ২৩১০০১২০০৮৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:গোলে জান্নাত ফেরদৌসী, আইডিঃ ২৩১০০১২০০৮৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছা:গোলে জান্নাত ফেরদৌসী

আইডিঃ ২৩১০০১২০০৮৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

প্রথম অধ্যায় 7

আল্লাহর পরে যার হক বড় 7

মাতা-পিতার গুরুত্ব 11

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো: 15

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো: 15

মাতা-পিতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার 16

ক্ষেত্র বিশেষে মাতা-পিতার সেবা করা জিহাদের চাইতে উত্তম 19

মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 21

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসিহত 22

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় 24

মাতা-পিতার অর্থনৈতিক অধিকার 26

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয় 27

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের শাস্তি ও পরিণাম 34

পিতা-মাতার হক আদায় করার ফলাফল : 35

পিতা-মাতার হক আদায় না করার (অবাধ্য হওয়ার) পরিণাম 36

দ্বিতীয় অধ্যায় সন্তানের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা : 38

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান লালন পালন : 39

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার চাওয়া 41

বেশীরভাগ মা-বাবার ভুল ধারণা 44

কিছু পারিবারিক নিয়ম থাকা উচিত 47

সন্তান লালন-পালন: মা-বাবার কিছু করণীয়: 50

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য 53

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি.....65
উত্তম ব্যবহার শিক্ষা দান.....71
দুষ্টামী আর বেয়াদবী এক নয়.....73
সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা.....74
সবচেয়ে বড় যুলুম:.....76
সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া.....78
তৃতীয় অধ্যায় সন্তানের চরিত্র গঠনের উপায়.....81
শিশুর চরিত্র গঠনের কিছু কার্যকর উপায় নিচে দেওয়া হলো:.....83
রসূল-সা: এর চরিত্রকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা:.....84
সন্তান প্রতিপালনে মহানবী (সা.)-এর ১০টি নির্দেশনা:.....84
সন্তানদের ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখাতে চেষ্টা করা.....88
আপনার সন্তানকে যে ৩ বিষয়ে শিক্ষা দিতে বলেছেন রাসূল (সাঃ):.....90
ইসলামে সঠিক সময়ে সন্তানকে বিয়ে করানোর গুরুত্ব:.....94
ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব:.....95
উপসংহার :.....98
তথ্য সূত্র /রেফারেন্স.....98

بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ

ভূমিকা

সন্তান যেমন পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার, তেমনি পিতা-মাতা সন্তানের জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নে'মত। দু'জন বিশ্বস্ত মানুষ বহুবিধ পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্য একজন মানুষকে তিলে তিলে বড় করে তোলে।

দু'জন নিঃস্বার্থ মানুষের পরিচয় পিতা ও মাতা। গর্ভ থেকে শুরু করে মা যেমন আপন সন্তানকে বহু কষ্ট ও ত্যাগ-তিতীক্ষার মাধ্যমে ধীরে-ধীরে বড় করে তুলতে সাহায্য করেন, তেমনি পিতাও সর্বোচ্চ শ্রম ঢেলে স্ত্রী-সন্তানের যাবতীয় ভরণ-পোষণ নির্বাহের কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

যার জন্য এত ত্যাগ, কষ্ট ও এত ভালোবাসা, সে হল সন্তান। আর সেজন্য পৃথিবীতে সন্তানের নিকট পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা সবার উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক, আর পিতা-মাতা হ'লেন সন্তানদের ইহকালীন জীবনের অভিভাবক। সুতরাং সন্তানদের কাজ হ'ল আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালনের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। জন্মের পর থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত সন্তান পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায় সারা জীবন সুসম্পর্ক অটুট ও বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

আমরা মা-বাবারা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কত কষ্টই না করে যাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক ছেলেমেয়েরাই মা-বাবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যে সন্তানদের উপর সঠিক সংশোধন প্রক্রিয়া প্রয়োগ না করার কারণে সন্তান মা-বাবার অবাধ্য হয়ে গেছে। এসব পরিস্থিতিতে নিরাশ হওয়া যাবে না। অবশ্যই প্রত্যেকটা সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। এ সমস্যার মূল কারণ কী এবং তার সমাধান কিভাবে করা যায় তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ

আল্লাহর পরে যার হক বড়

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন এবং তার নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা এক দিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটা একটা দ্বীনী কর্তব্যও।

পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। মাতা-পিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বর্ণনা ভঙ্গী থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
পবিত্র কুরআনুল কারীমে

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وقطى زياد أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

'আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

ولا أعدنا ميقال بني إسرائيل لا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله وبالوالدين إحسانا-

"আমি বনি ইসরাইলের নিকট থেকে অস্বীকার নিয়েছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

والعبدُوا الله ولا تشركوا به شيئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"

আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেন-

وَإِن جَاهَنَاكَ عَلى أن الشرك بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا لَطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ا معروفا -

'তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরিক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই। তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার নির্দেশের পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহর হকের পরেই বড়ো হক হচ্ছে, মাতা-পিতার হক।

আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক আরও বলেন:

وقضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

ربيني صغيرا بنى اسرائيل٢٣-٢٤ :

“এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা

ভর্ৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো যেমন, হে পরওয়ারদিগার! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো।যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।"-সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪

কুরআন হাকিমের এ দুটি আয়াত বার বার পাঠ করলে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কতিপয় জিনিস সুন্দরভাবে ধরা দেবে:

প্রথমত, মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। কুরআনে হাকিমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতপর এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলমানদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে মাতা-পিতার রুক্ষ মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে বরদাশত করা এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেয়া।

সন্তানদেরকে শৈশবকালের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতা-পিতাকে পেরেশান করতো। কিন্তু মা-বাপ হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশী হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।
তৃতীয়ত, মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল দিতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন শক্তি রহিত হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতার মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের

মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বার বার গোস্বা করেন। বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হাসি মুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত, আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের সামনে মাথা নীচু রাখা আবশ্যক। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে মাতা-পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত আনজাম দেয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা এবং ইহসান প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করা উচিত এবং এ খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার।

পঞ্চমত, মাতা-পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় ও মজবুর থাকে। তখন মাতা-পিতার কত স্নেহ ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন-পালন করেন। শিশুর আনন্দে আনন্দিত হন এবং তার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করে মুহাব্বত ও রহমাতের আবেগে অবলীলাক্রমে বার বার দোয়ার জন্য উঁচিয়ে বলতে থাকে, হে পরওয়াদিগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মুহাব্বতের সাথে তাঁরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দাও।

কুরআনে হাকিমের এ দু আয়াতে যে কথাগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বা হাদীসে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়।

মাতা-পিতার গুরুত্ব

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَق الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ابن ماجه، مشكوة

"হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِد- ِ

"হযরত আবদিল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

মাতা-পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ من أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو، وَقَدْ جِئْتُ اسْتَشِيرُكَ ؟ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا - ابن ماجه، نسائ

"হযরত জাহিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন?

জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই বেহেশত।"

"তাঁর পায়ের তলায় বেহেশত" কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, তাঁকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর খিদমত ও খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদীসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস তিবরণীতে মাতা ও পিতা উভয়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে চাই। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মাতা-পিতা (জীবিত) আছেন? আমি আরজ করলাম, জ্বী হাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, যাও, তাঁদের খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁদের পায়ের নীচেই বেহেশত রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ مَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّة- َ

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে অতপর (তাঁদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পরেই সবচেয়ে বড় হক বা অধিকার হলো পিতা-মাতার। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর ইবাদতের ঠিক পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়াবলি নিচে দেওয়া হলো:

মায়ের অধিকার সর্বাধিক: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহারের অধিকারী কে?" তিনি তিনবার "মা" বললেন এবং চতুর্থবার "পিতা" বললেন।

সন্তানের জন্য জান্নাত-জাহান্নাম: হাদিস শরীফে এসেছে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে.। তাদের সেবা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে খুব সহজেই জান্নাত লাভ করা সম্ভব।
পিতা মাতার হক সম্পর্কে হাদিস

একজন সাহাবি নবীজি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি আবারও জানতে

চাইলেন, নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। এরপর সাহাবি জানতে চাইলে নবীজি (সা.) বললেন, তোমার বাবার। (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পিতা-মাতা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।' (ইবনে মাজাহ)। পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য যেমন রয়েছে অভিসম্পাত, তেমনি তাঁদের আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরস্কারের ঘোষণা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।' (বায়হাকি)।

এক সাহাবি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আমার পিতা-মাতা ইন্তেকালের পরেও কি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে?' তখন নবী করিম (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। তা হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করা, তাদের শরিয়তসম্মত অসিয়তগুলো আদায় করা, তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলো পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তঁাদের সঙ্গে উত্তম আচরণের শামিল।' (আবু দাউদ)। অন্য হাদিসে আছে, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিজি)। পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।' (সুরা-১৭ বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৪)।

পিতা মাতার হক ১৪ টি

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো:

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো:

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

মাতা-পিতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার

মাতা-পিতার খিদমত এবং অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশত নসীব হয়। এ তো আখেরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা সাচ্চা অন্তরে মাতা-পিতার খিদমত করে এবং অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ পাক এ দুনিয়াতেও তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার স্বয়ং নিজের সাথীদেরকে তিন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, একবার তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টিতে ঘিরে ধরলো। আশ্রয়ের জন্য তারা এক গুহায় প্রবেশ করে বসে গেলো। আল্লাহর মহিমা! পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর ধসে গুহার মুখের উপর এসে পড়লো এবং গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো। তিন বন্ধু সাংঘাতিকভাবে ঘাবড়ে গেলো। ঘাবড়ানোর কথাও। পাথর সরানো তাদের সাধ্যের বাইরে ছিলো। সেখানে কোনো মানুষও ছিলো না যে, সাহায্যের জন্য ডাক দেয়। নিরাশ হয়ে তারা বসে রইলো এবং ধারণা করলো যে, জীবিত দাফন হয়ে গেছি এবং সেই গুহাই তাদের কবর। তাদের মধ্যে একজন বললো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হলে চলবে না। এসো আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করি। আশা করি, আল্লাহ নিজের রহমতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে মুক্তি দেবেন।

তাদের মধ্যে একজন মুসাফির বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিলো। আমি দিনে বকরী চরিয়ে ঘরে ফিরতাম এবং দুধ দুইয়ে সর্বপ্রথম মাতা-পিতাকে পান করাতাম। এরপর নিজের শিশুদেরকে দিতাম। ঘটনাক্রমে আমি একদিন অনেক দূরে চলে গেলাম এবং ফিরতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেলো। রাতে যখন আমি ঘরে ফিরলাম তখন মাতা-পিতা ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো আমি বকরীর দুধ দোহন করলাম এবং এক পেয়ালায় ভরে মাতা-পিতার শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কখন তাঁরা জাগবে এবং আমি তাঁদের সামনে দুধ পেশ করবো। বেশ খানিক রাত হয়ে গেলো। আমার শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতে লাগলো। তারা বারবার আমার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ছিলো এবং দুধ দুধ করছিলো। কিন্তু পিতা-মাতার আগে তাদেরকে দুধ পান করানো আমি সহ্য করতে পারলাম না। মাতা-পিতা অভুক্ত শুয়ে থাকবেন আর আমার শিশুরা পেট পুরে আরাম করবে,
এটা হতে পারে না।
মোটকথা, সারা রাত আমি তেমনি পেয়ালা দাঁড়িয়ে রইলাম। মাতা-পিতা ঘুমুতে লাগলেন এবং শিশুরা ক্ষুধায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে সারা রাত কেটে গেলো। হে আল্লাহ! আমি যদি মাতা-পিতার সাথে এ আচরণ শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তোমার রহমাতের সাহায্যে এ পাথরকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দাও।
একথা বলতেই পাথর গুহার মুখ থেকে কিছুটা সরে গেলো এবং পরিষ্কারভাবে আকাশ নজরে পড়তে লাগলো। অতপর অন্য মুসাফির দুজনও স্ব স্ব নেক কাজের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করলো এবং আল্লাহ স্বীয় রহমাতের মাধ্যমে গুহার মুখ খুলে দিলেন।

পিতা-মাতার খেদমত বা সেবা হলো সন্তানের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ইসলামের ইতিহাস ও বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে নেওয়া হৃদয়স্পর্শী কিছু ঘটনা নিচে দেওয়া হলো:

১. হযরত উওয়াইস আল-কারনি (রহ.)-এর ঘটনা:

ইয়েমেনের এক দরিদ্র ও অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন উওয়াইস। তাঁর কোনো ভাই-বোন ছিল না এবং তিনি দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা মায়ের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। মায়ের খেদমত ও সন্তুষ্টির জন্য তিনি নিজের জীবনের সব সময় উৎসর্গ করেছিলেন। মা ছাড়া তাঁর দুনিয়ায় কেউ ছিল না বলে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় মদিনায় গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ করার সুযোগও পাননি।

মায়ের সেবা ও সম্মতির প্রতি তাঁর এমন অবিচল নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের কথা স্বয়ং নবীজি (সা.) সাহাবিদের জানিয়েছিলেন। নবীজি (সা.) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, উওয়াইস এমন এক মহান আল্লাহর ওলি হবেন যে, যদি তিনি আল্লাহর নামে কোনো কসম করেন, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন। পরবর্তীকালে সাহাবিরা তাঁর সেই অসামান্য খেদমতের বরকতের কথা ও অলৌকিক ঘটনার সত্যতা পান।

২. হজরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) ও মায়ের পানির গ্লাস:

বিখ্যাত সুফি সাধক বায়জিদ বোস্তামী তাঁর শৈশবে মায়ের প্রতি নিখাদ সেবার জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। গভীর রাতে তিনি মায়ের শয্যাপাশে বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মা ঘুম থেকে জেগে পানি পান করতে চান।

বাড়িতে পানি না থাকায় বায়জিদ বাইরে প্রচণ্ড শীতে তীব্র অন্ধকারে হেঁটে নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন তাঁর মা আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন তিনি মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে ছেলের হাতে পানির গ্লাস ও তাঁর এই আত্মত্যাগের ঘটনা দেখে মা অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হন এবং তাঁর জন্য অঝোরে দোয়া করেন।

৩. ইবনে উমর (রা.) ও দাস মুক্ত করার ঘটনা:

একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে তার বৃদ্ধা মায়ের কাঁধে চড়ে হজ করতে দেখেন। ব্যক্তিটি ইবনে উমর (রা.)-এর কাছে জানতে চান যে, এতে মায়ের হক আদায় হলো কি না।

উত্তরে তিনি বলেন, "না, তোমার মা যে তোমার জন্য সারা রাত জেগে কষ্ট সহ্য করেছেন, তার একটি রাতের বিনিময়ও এর মাধ্যমে পরিশোধ হয়নি। তবে তুমি তোমার এই মহান খেদমতের মাধ্যমে অনেক সওয়াব অর্জন করেছ।"

ক্ষেত্র বিশেষে মাতা-পিতার সেবা করা জিহাদের চাইতে উত্তম

মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই।'

তিনি বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে আছেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন।'

তিনি বললেন, 'যাও, তার খেদমতে আত্মনিয়োগ করো।'

এরপর আমি অন্যদিক থেকে এসে আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই।'

তিনি বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে নেই?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন।'

তিনি বললেন, 'যাও, তাঁর সেবা কর।

অতঃপর আমি তাঁর সামনের দিক দিয়ে এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সফলতা লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে শামিল হতে চাই।'

তিনি বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে নেই?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা বেঁচে আছেন।'

তিনি আমাকে বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য! তুমি তোমার মায়ের চরণ আঁকড়ে ধর। সেখানেই রয়েছে জান্নাত।'

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে

দীনে হিজরত ও জিহাদের যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে। এ সত্ত্বেও যদি মাতা-পিতা বার্ধক্য, দুর্বলতা অথবা কোনো মাজুরীর কারণে সন্তানের সাহায্য ও খিদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান তাঁদের খিদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষী হবে। আর তাতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ধরনের অসহায় অবস্থায় ইসলামে মাতা-পিতার সান্নিধ্যে থেকে খিদমত করা হিজরত ও জিহাদের মতো উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মাতা-পিতাকে কাঁদায়ে রেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের খিদমতে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যাও, মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো।"-আবু দাউদ

তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন? সে বললো, জ্বী হাঁ। আল্লাহর শোকর যে, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাঁদের খিদমত করতে থাকো। এটাই জিহাদ।

-মুসলিম

মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضـ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلْ لَّكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ قَالَ، أَبَوَلَى، قَالَ أَذِنَالَكَ ؟ قَالَ لا، قَالَ، ارْجِعُ إِلَيْهِمَا ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَالَكَ فَجَاهِدُ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا - ابوداود

"হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, জনৈক ইয়েমেনী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বললো, জ্বী হাঁ। আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের নিকট থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নচেৎ তাঁদের নিকট উপস্থিত থেকে সুন্দর আচরণ করতে থাকো।"

এক ব্যক্তি মাইলের পর মাইল দূর অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসেছিলো। আর এসেছিলোও এমন নেক নিয়ত নিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে দীনের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাবে। কিন্তু তিনি শুধু এ কারণে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে আসেনি এবং মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজে তাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। এ হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, দীন মাতা-পিতার প্রতি কি ধরনের শ্রদ্ধাশীল এবং কেমন সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসিহত

একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি তোমার কি হন? সে বললো, হযরত! ইনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বললেন, দেখ কখনো তাঁর নাম ধরে ডেকো না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোনো মজলিসে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না। **-আল আদাবুল মুফরাদ**

মাতা-পিতার বদলা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ

إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيَعْتِقَهُ - مسلم، ترمذى، ابو ادود وغيره

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার স্নেহ, ভালোবাসা, লালন-পালন এবং কষ্ট সহ্যের বদলা যদি সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু হয় তাহলে সে যদি পিতাকে কারোর গোলাম অবস্থায় পায় অথবা মাতাকে বাঁদী হিসেবে পায় তাহলে তাঁদেরকে ক্রয় করে আযাদ করে দেবে।"

মাতার বদলা

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ইয়েমেনীকে নিজের মাতাকে পিঠে বসিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখলেন। সে ব্যক্তি কা'বা তাওয়াফ করছিলেন এবং অত্যন্ত আবেগের সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।"

আমি তাঁর ইঙ্গিতে চলনেওয়ালা সওয়ারী উট

যখন তাঁর সওয়ারী ভয়ে ভাগে তখন আমি দেইনা ছুট

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, বলুন আমি তো মাতার বদলা দিয়ে দিয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মাতার বদলা! এটা তো তাঁর এক 'আহ!' শব্দেরও বদলা হয়নি।

মায়ের সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আচরণ

একবার মারওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু দিনের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি জুল হুলাইফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাতা কিছু দূরে অন্য এক বাড়ীতে ছিলেন। যখনই তিনি বাইরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই প্রথমে এসে মাতার দরজায় দাঁড়াতেন এবং বলতেন, প্রিয় আম্মাজান! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আম্মাজান ভেতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আম্মাজান! শৈশবকালে যেমন আপনি স্নেহ ও মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন তেমনি যেন আল্লাহ পাক আপনার উপর রহম করেন। তিনি জবাবে বলতেন, প্রিয় পুত্র! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যে ধরনের সুন্দর আচরণ করেছো এবং আরাম দিয়েছো আল্লাহও যেন তোমার প্রতি সে ধরনের রহমাত নাযিল করেন।

অতপর তিনি যখন বাইরে থেকে আসতেন এবং ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তেমনি ভাবে মাতাকে সালাম করতেন ও একই কথা বলতেন।

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

পিতা-মাতার আনুগত্য করা:

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বড় নে'মত। তারা সর্বদা সন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। অনেক সময় পিতা-মাতার মতের সাথে সন্তানের মতের অমিল হতে পারে। এমত পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য আবশ্যক হ'ল পিতা-মাতার আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا.

'ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে' (নিসা ৪/৩৬)।

তিনি আরো বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'আর যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে' (বাক্বারাহ ২/৮৩)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলে

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

مِن إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُم

ঁ 'তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' (আন'আম ৬/১৫১)।

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে একনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পিতামাতাকেও তাদের গর্ভধারণকালীন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিতা-মাতা সন্তানকে কোন সময়

আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে না বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ - أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُون َ

'তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম আ:) থেকে। অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়াআ:)-কে। যাতে সে তার নিকটে প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তাকে আবৃত করে, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। আর এটা নিয়েই সে চলাফেরা করে। অতঃপর যখন তা ভারি হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, যদি তুমি আমাদেরকে সুসন্তান দাও, তাহ'লে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে সুঠামদেহী সন্তান দান করেন, তখন তারা আল্লাহর এই দানে তার সঙ্গে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে। অথচ তারা যেসব বিষয়কে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ

তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারা কি এমন বিষয়কে শরীক নির্ধারণ করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট' (আ'রাফ ৭/১৮৯-১৯১)। অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে, যুরারাহ বিন আওফা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِلَيَّ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنَّ أَبَوَي يَمْتَعَانِي قَالَ : أَطِعْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسُ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَك- َ

'জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।

মাতা-পিতার অর্থনৈতিক অধিকার

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلْوَالِدَيْن- ِ

“লোকজন 'আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ বা ব্যয় করবো। জবাবে বলে দিন, যে মালই তোমরা খরচ করো তার প্রথম হকদার হলো মাতা-পিতা।"-সূরা আল বাকারা: ২১৫

কুরআন ও সুন্নাতে যেভাবে মাতা-পিতার খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি মাতা-পিতার উপর খরচ না করে ধন-সম্পদ বাঁচানো সঠিক নয় বলেও তাকিদ দেয়া হয়েছে। বরং সর্বপ্রথম তাদের উপরই খরচ করতে হবে। আর তাঁরা যদি অভাবগ্রস্ত হন

তাহলে জবরদস্তি করেই নিতে পারেন। যদি কেউ মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনে কমতি না করেও অর্থ খরচ করতে না চায়, তাহলে সেটাও ঠিক হবে না। যেভাবে সন্তানের উপর তাদের অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের সম্পদের উপরও তাঁদের অধিকার আছে।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং নিজের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো ইচ্ছা হলেই সে আমার সম্পদ নিয়ে

নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তির পিতাকে ডাকলেন। লাঠির উপর ভর দিয়ে এক দুর্বল বৃদ্ধ এসে হাজির হলো। তিনি বৃদ্ধকে সব জিজ্ঞেস শুরু করলে সে বললো: আল্লাহর রাসূল! এক যুগ ছিলো যখন এ দুর্বল আরো অসহায় ছিলো এবং আমি শক্তি সম্পন্ন ছিলাম। আমি বিত্তশালী ছিলাম। আর সে ছিলো কপর্দক শূন্য। আমি কখনো তাকে আমার সম্পদ নেয়ায় বাধা দিইনি। আজ আমি দুর্বল। সে সুঠাম ও শক্তিশালী। আমি কপর্দক শূন্য। সে বিত্তশালি। এখন সে নিজের সম্পদ আমাকে দেয় না।
একথা শুনে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে দিলেন এবং বললেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।”

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয়

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِ ابَوَى شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا قَالَ نَعَمْ . خصَالُ أَرْبَعُ الدُّعَاءُ لَهُمَا ، وَالْاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَأَكْرِمُ

صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَأَرَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا-

"হযরত আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জি জ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জ্বী হাঁ। চারটি সুরত রয়েছে-(১) মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার, (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ, (৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারী ও (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মাতা-পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।"-আল আদাবুল মাফরুজ

মাতা-পিতা শিশু লালন-পালন এবং প্রশিক্ষণের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন এবং দিবা-রাত্রি তত্ত্বাবধান করেন। আসল কথা হলো: আপনি যদি জীবনভরও দাস-দাসীর মতো তাঁদের খিদমত করতে থাকেন, তবুও তাঁদের খিদমতের হক আদায় হতে পারে না। এ কারণেই একজন মুমিন সারা জীবন মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করে থাকে। কিন্তু যখন মাতা-পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখনো চিন্তা করতে থাকেন যে, হায় আমি তো কিছুই করতে পারিনি। আর এজন্যেই তিনি তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের রূহকে খুশী করার জন্য কোনো পন্থা কামনা করেন। এ ধরনের মুমিনের প্রাণের আবেগ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন জনৈক ব্যক্তি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, ওফাতের পরও তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা যায় এবং এ আচরণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করে দেন।

এক: দোয়া ও ইসতিগফার: নামাযের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করুন। তাঁদের গুনাহসমূহকে ঢেকে দিন এবং তাঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দাহ-বান্দীকে দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ! যখন আমরা তাঁদের সাহায্য, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সবকিছু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। দিনে আয়েশ এবং রাতের আরাম আমাদের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। পরওয়াদিগার! এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত। শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলাম। এখন তাঁরা সেই সময়ের চেয়ে বেশী তোমার রহমাত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। পরওয়ারদিগার! তুমি তাঁদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান করো এবং নিজের সন্তুষ্টির ঘর জান্নাতে তাঁদের আশ্রয় দাও।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর যখন মাইয়েতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যান তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বিষয় এমন যা তার মৃত্যুর পরও

উপকার করতে থাকে। প্রথম, ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়, তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয়, সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই একজন মশহুর বুজর্গ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক রাতে আমরা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরাকে ক্ষমা করো এবং হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরার মাতাকে ক্ষমা করো এবং হে পরওয়ারদিগার! তাদের সবাইকে ক্ষমা করো, যারা আবু হুরাইরাহ এবং তার মাতার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন, আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ায় শামিল থাকি।

দুই: মাতা-পিতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা: মাতা-পিতা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কিছু ওসিয়ত করতে পারেন।

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে। তাহলো তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। আর এভাবেই তাঁদের রূহকে খুশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু তাঁদের জায়েয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাঁদের অবৈধ ওসিয়তও পূরণ করা হয় তাহলে এটা তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে না বরং খারাপ আচরণ হবে।

মাতা-পিতা যদি কারোর সাথে আর্থিক সাহায্য দানের ওয়াদা করে থাকেন অথবা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর জীবনে যদি তার সুযোগ না পান অথবা তাঁরা কোনো মানত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অথবা তিনি ঋণী ছিলেন অথবা ওসিয়াত করার সুযোগ পাননি, অথচ আপনি বুঝেন যে, সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসিয়াত করতেন অথবা তিনি

কোনো ওসিয়ত করেননি। আপনি যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাদকাহ করেন তাহলে এসবই তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে। আর এভাবেই তাঁদের ওফাতের পরও আপনি জীবনভর তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন নয়।

এ হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুই বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ওফাত পেয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কেন নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

তিন: মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে আচরণ: মাতা-পিতার ওফাতের পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বুজর্গ ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমল

একবার হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইলো না। এ সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত! শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে হাজির হয়েছি। কেননা শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো।

০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক বুদ্দুর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। বুদ্দু হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন, জ্বী হাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের গাধার উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে বললাম, হে হযরত! সে তো একজন বুদ্দু অথবা গ্রামবাসী। আপনি যদি দু দেরহাম দিয়ে দিতেন তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ভাই তাঁর পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো ও এ সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। নচেৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

চার:মাতা-পিতার ঋণের চিন্তা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি মাতা-পিতার খিদমত এবং অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা করেননি। জীবিতাবস্থায় যেমন খেয়াল রাখতেন তেমনি মৃত্যুর পরও তিনি মাতা-পিতার অধিকারের প্রতি পুরোপুরিই দৃষ্টি রেখেছিলেন। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু

অত্যন্ত সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণত যখন কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তখন মৃত্যুর পর পরই তার উত্তরাধিকার রা নিজেদের অংশের চিন্তায় পড়ে যায়। কিন্তু সাধারণ দুনিয়াদারদের মতো তিনি নিজের অংশের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তাগ্রস্ত হননি। অথচ মিরাছ সূত্রে তাঁর প্রাপ্য ছিলো কোটি কোটি পরিমাণের। অবশ্য তাঁর চিন্তা একটিই ছিলো যে, পিতা কারোর নিকট ঋণগ্রস্ত রয়ে যাননি তো? বস্তুত তিনি সর্বপ্রথম রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে পিতার ঋণ পরিশোধ করেন। ঋণ পরিশোধের পর অন্যান্য উত্তরাধিকাররা মিরাছ বণ্টনে তাগাদা প্রদান এবং দাবী উত্থাপন শুরু করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ মিরাছ বণ্টনে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, চার বছর অব্যাহতভাবে হজ্জের মওসুমে পিতার ঋণের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা দিতে থাকবেন। যদি কোনো পাওনাদার থাকে তাহলে সে তা আদায় করে দেবে। কোনো পাওনাদার থাকতেও তো পারে! চার বছর এভাবে ঘোষণা দানের পর তিনি মিরাছ বণ্টন করবেন।

এভাবে তিনি অন্যান্যদেরকে মিরাছ বণ্টনে চার বছর বিলম্ব করার প্রশ্নে সম্মত করিয়ে নিলেন এবং হজ্জের মওসুমে ঘোষণা দিয়ে পিতার জন্য হাজার হাজার মানুষ দিয়ে দোয়া ও মাগফিরাত করিয়ে নিতে থাকেন।

মাতা-পিতার প্রতি অসদাচরণের ভয়াবহ পরিণতি

মাতা-পিতার প্রতি অসদাচরণ বা অবাধ্যতা একটি জঘন্যতম কবিরা গুনাহ। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, যা দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় জগতেই ধ্বংস ডেকে আনে। মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ইহকালে দ্রুত শাস্তি (দুনিয়াবী পরিণতি)

হাদিস শরিফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা সাধারণত বান্দার সকল পাপের শাস্তি আখেরাতে স্থগিত রাখেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দুনিয়াতেই দ্রুত দিয়ে থাকেন।

বরকত ও শান্তি বিনষ্ট: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের জীবন থেকে বরকত উঠে যায়। সে দুনিয়াতে চরম অশান্তি ও সংকটে ভোগে।
সন্তানের কাছ থেকে প্রতিদান না পাওয়া:
প্রকৃতি ও ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী, আজ আপনি আপনার মা-বাবার সাথে যেমন আচরণ করবেন, ভবিষ্যতে আপনার সন্তানও আপনার সাথে ঠিক তেমন আচরণই করবে।

২. নেক আমল ও ইবাদত কবুল না হওয়া:
মা-বাবা অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহর দরবারে সন্তানের কোনো ইবাদত কবুল হয় না। সে যতই নামাজ, রোজা বা দান-খয়রাত করুক না কেন, মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণে তার আমলগুলো প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

৩. পরকালে ভয়াবহ শাস্তি (আখেরাতের পরিণতি):
পরকালীন জীবনে অবাধ্য সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন ও মর্মস্পর্শী শাস্তি।

জান্নাত থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া: রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোরভাবে বলেছেন যে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া:
কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহতায়ালা তিন শ্রেণির মানুষের দিকে রহমতের দৃষ্টি দেবেন না, যার মধ্যে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান অন্যতম।

জাহান্নামের কঠিন শাস্তি: মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়ার পরিণামে পরকালে জাহান্নামের চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪. পিতা-মাতার বদদোয়া বা অভিশাপ:
মা-বাবার দোয়া যেমন দ্রুত কবুল হয়, তেমনি তাদের দেওয়া বদদোয়াও আল্লাহ কখনোই ফিরিয়ে দেন না। সন্তানের আচরণে কষ্ট পেয়ে তারা যদি মন থেকে অভিশাপ দেন, তবে তা সন্তানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা এতোটাই উচ্চে যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইবাদতের পরপরই তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি বার্ধক্যে তাদের সামনে 'উফ!' শব্দটি উচ্চারণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের শাস্তি ও পরিণাম

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ইসলামে একটি বড় ধরনের অপরাধ এবং কবিরা গুনাহ। এর শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় ক্ষেত্রেই ভয়াবহ।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রভুর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং প্রভুর অসন্তুষ্টি মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে"। অবাধ্য সন্তানের জন্য জান্নাত হারাম, অভিশাপ এবং পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহর অসন্তুষ্টি: মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

জান্নাত হারাম: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

অভিশপ্ত জীবন: রাসূল (সা.) বলেছেন,
যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করল সে অভিশপ্ত।

দুনিয়াতেই শাস্তি: অবাধ্য সন্তানের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা দুনিয়াতেই নিজ অবাধ্যতার ফল ভোগ করে (যেমন- নিজের সন্তান অবাধ্য হওয়া)।

দোয়া কবুল না হওয়া: মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের কোনো নেক আমল বা দোয়া কবুল হয় না।

জাহান্নামের দুয়ার: পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট থাকলে সন্তানের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে যায়।

সতর্কতা: ইসলাম অনুযায়ী, মা-বাবা যদি অত্যাচারীও হন, তবুও তাদের অবাধ্য হওয়া বা কষ্ট দেওয়া জায়েজ নেই। তাই প্রতিটি সন্তানের উচিত মা-বাবার খেদমত করা এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।

পিতা-মাতার হক আদায় করার ফলাফল :

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আনুগত্য করার মাধ্যমে সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর হয়।

এর সুফলগুলোর মধ্যে রয়েছে:

জান্নাত লাভ: পিতা-মাতা হলেন সন্তানের জান্নাত লাভের মাধ্যম। তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে জান্নাত পাওয়া সহজ হয়।

দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ: পিতা-মাতার দোয়ায় সন্তানের জীবন বরকতময় হয় এবং আল্লাহ তাআলা তার সব কাজে রহমত বর্ষণ করেন।

রিজক বৃদ্ধি ও আয়ু বৃদ্ধি: সহিহ হাদিস অনুযায়ী, পিতা-মাতার সেবা ও সদ্ব্যবহারের কারণে আল্লাহ সন্তানের বয়স ও রিজক বৃদ্ধি করে দেন।

পিতা-মাতার হক আদায় না করার (অবাধ্য হওয়ার) পরিণাম

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা তাদের কষ্ট দেওয়া ইসলামে কবিরা বা বড় গুনাহ। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ, যার শাস্তি দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতেই ভোগ করতে হতে পারে।

দুনিয়াতেই শাস্তি: হাদিস শরীফে এসেছে, অন্যান্য সব গুনাহের শাস্তি আল্লাহ চাইলে আখেরাত পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন।

ধ্বংস ও অভিশাপ: যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, সে আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র সৃষ্টির অভিশাপে অভিশপ্ত হয়।

ইবাদত কবুল না হওয়া: পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহর দরবারে সন্তানের কোনো ইবাদত বা নেক আমল কবুল হয় না।

আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি: পরকালে তাদের জন্য কঠিন আজাব অপেক্ষা করে এবং তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।

মাতা-পিতার হক আদায় করা ও না করার পরিণাম:

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশের অনুগত হয়ে সকালবেলায় উপনীত হয়, সে যেন তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। যদি তাদের একজন বেঁচে থাকে। (যার সে অনুগত থাকে) তবে সে জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল।

আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশের নাফরমান হিসেবে সকাল বেলায় উপনীত হয়, তার জন্য জাহান্নামের দু-টি দরজা খোলা অবস্থায় সে সকাল করল।

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'যদি তারা উভয়ে পুত্রের প্রতি জুলুম করে?' তিনি বললেন, 'যদিও তারা পুত্রের প্রতি জুলুম করে, যদিও তারা পুত্রের প্রতি জুলুম করে, যদিও তারা পুত্রের প্রতি জুলুম করে।'মিশকাতুল মাসাবিহ'

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কি অধিকার আছে?' তিনি বলেন, 'তারা উভয়ে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। 'ইবনে মাজাহ'

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, 'আমার একজন স্ত্রী আছে, আমার মা আমাকে আদেশ করেন, তাকে তালাক দিতে।' তখন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাতা-পিতা হচ্ছে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটিকে রক্ষা করতে পার। ইচ্ছা করলে দরজাটি নষ্টও করতে পার।

দ্বিতীয় অধ্যায় সন্তানের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা :

প্রত্যেক মা-ই এটা চায় যে, তার সন্তান তার অন্তরের শান্তি এবং চক্ষু শীতলকারী হোক। দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য ইজ্জত ও আরামের মাধ্যম হোক। তার বংশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হোক। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা নি:সন্দেহে মর্যাদা পাবার যোগ্য। কিন্তু কোনো আকাঙ্ক্ষাই শুধু দোয়ার মাধ্যমে পূরণ হয় না। আপনাদের দোয়া পবিত্র, আপনাদের আকাঙ্ক্ষাও পবিত্র; কিন্তু শুধু দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। নিজের দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে চেষ্টার হক আদায় না করলে তা কখনো সাফল্যের রূপ দেখবে না।

সন্তানের ভালো এবং উন্নত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা কে না করে থাকে। কোনো মা এ আশা করে যে, তার সন্তান ভ্রষ্ট পথে চলুক? সন্তানের খারাপ কাজ এবং পথভ্রষ্টতায় কার না অন্তরে বাজে। সন্তান যদি লজ্জিত এবং ব্যর্থ হয় তাহলে কোন্ মা'র চক্ষু দিয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত না হয়। আর সন্তানের সার্থক ভবিষ্যত দেখে কোন্ মা খুশীতে বাগ বাগ না হয়। কিন্তু শুধু ভালো আবেগ-অনুভূতি দিয়েই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হলো তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং তাদের অধিকার আদায়ের পুরো চেষ্টা করা। আপনি নিজের দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের পরই সন্তানদেরকে অধিকার আদায়ের শিক্ষা দিতে পারেন। আপনি যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই না রাখেন তাহলে আপনি তাদের অধিকার কিভাবে আদায় করবেন।

সন্তানের অধিকারসমূহ আদায়ে আপনাকে এজন্যও তৎপর হওয়া প্রয়োজন যে, এটা আপনার দীনি দায়িত্ব। তাদের অধিকারসমূহ আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং একদিন তিনি এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ হলো:

"এবং মহিলা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক। তোমরা সবাই (নিজ নিজ অবস্থা) অনুযায়ী রক্ষক এবং তোমাদের সকলের নিকটই তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।"-বুখারী ও মুসলিম

নি:সন্দেহে পিতাও নিজের সন্তানের রক্ষক এবং তাদের অধিকারসমূহের জিম্মাদার। কিন্তু এটা বাস্তব যে, মা'র দায়িত্ব কিছুটা বেশী। পিতা জীবিকার জন্যে দৌঁড়-ঝাপের কারণে বেশীর ভাগ সময় ঘরের বাইরে অবস্থান করে। গৃহে সবসময় মাতাই শিশুদের সাথে থাকেন এবং শিশুও মা'র প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়। শিশুদের উপর খেয়াল দেয়ার প্রকৃতিগতভাবেই মা বেশী সময় এবং শিশুও মায়ের প্রভাব কিছু গ্রহণ করে।

সন্তানের অধিকার বলতে জন্ম থেকে শুরু করে সাবালক হওয়া পর্যন্ত তাদের শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা ও সুরক্ষাকে বোঝায়। বাবা-মা ও অভিভাবক হিসেবে সন্তানের এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করা প্রধান দায়িত্ব। নিচে সন্তানের প্রধান অধিকারগুলো স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হলো:

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান লালন পালন :

১. সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা

শিশুর জন্মের পর তার একটি সুন্দর, অর্থবহ এবং সম্মানজনক নাম রাখা বাবা-মায়ের প্রথম দায়িত্ব।

২. বংশপরিচয় ও বৈধ অধিকার

সন্তান যেন সমাজে মাথা উঁচু করে নিজের পরিচয় দিতে পারে, সেজন্য পিতা-মাতার বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পারিবারিক পরিচয় নিশ্চিত করা সন্তানের অন্যতম অধিকার।

৩.খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা

সন্তানের মৌলিক শারীরিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, নিরাপদ বাসস্থান এবং অসুস্থতায় সঠিক চিকিৎসা ও পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৪.নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই সততা, মানবিকতা, নৈতিক চরিত্র এবং নিজ নিজ ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া বাবা-মায়ের নৈতিক দায়িত্ব।

৫. সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি তার মেধা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব।

৬. ভালোবাসা ও স্নেহ

সন্তানের মানসিক বিকাশের জন্য পারিবারিক পরিবেশ হওয়া চাই ভীতিহীন ও আনন্দময়। শাসন বা ভর্ৎসনার বদলে স্নেহ, মমতা ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তাদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সন্তানকে পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্তে যুক্ত করা এবং তাদের নিজস্ব মতামত বা পছন্দকে সম্মান
জানানোর চর্চা করা জরুরি।

৮. বৈষম্যহীন আচরণ

ছেলে বা মেয়ে সন্তানের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য না করে, সকল সন্তানকে সমান চোখে দেখা এবং তাদের মাঝে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন করা বাবা মায়ের দায়িত্ব।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার চাওয়া

প্রতিটি মা-বাবাই চান তাদের সন্তানরা ভাল হোক, সঠিক পথে থাকুক, তারা ইসলামী মনমানসিকতার হোক। কিন্তু আমাদের এই চাওয়াটা শুধু "One way", অর্থাৎ আমরা মা-বাবারা সবাই চাই সন্তান ভাল হোক কিন্তু আমরা নিজেদের ভাল হওয়ার ব্যাপারে তেমন সচেতন এবং সচেষ্ট নই। আমরা নিজেরা যেভাবে ইচ্ছে চলবো, যেখানে ইচ্ছে যাবো কিন্তু সন্তানদের বেলায় চাই বিনা চেষ্টাতেই তারা সঠিক পথে চলুক যা কখনো সম্ভব নয়।

মাটি যখন নরম থাকে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা যায়। কিন্তু মাটি শক্ত হয়ে গেলে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা খুবই কঠিন। পাত্র যদিও তৈরী করা যেতে পারে সেজন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তাই আমাদের সন্তান যখন কম বয়সের থাকে তখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বড় হয়ে গেলে এই পরিবেশে সঠিক পথে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। যাদের সন্তান বড় হয়ে গেছে তাদের তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

উদাহরণ ১: টরন্টোর একটি বাস্তব ঘটনা। একটি ইসলামিক প্রোগামে মা তার ক্লাস নাইনে পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে এসেছেন কিছু ইসলামী কথা শুনানোর জন্যে। প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু এক মুহূর্তে এসে ঐ মেয়ের আর এসব কুরআন-হাদীসের কথা ভাল লাগছে না। সে কোনভাবেই বসে থাকতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে দুই হাত দিয়ে নিজের দুই কান চেপে ধরে বসে আছে যেন ইসলামের কথা শুনতে না হয়। এখানে মেয়ের কোন দোষ নেই, কারণ সে ছোটবেলা থেকে এই ধরনের কোন কথা শুনেনি। তাই তার কাছে কুরআনের কথাগুলো ভাল লাগছে না, অসহ্য মনে হচ্ছে। এখানে দোষ মা-বাবার।

উদাহরণ ২: এটিও টরোন্টর একটি ঘটনা। একটি পরিবার তার সন্তানদের ইসলামের কথা শুনানোর জন্য তার নিজের বাসায়ই একদিন ইসলামিক প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। ড্রইংরুমে প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু বাড়িওয়ালার হাইস্কুলে বা কলেজে পড়ুয়া ছেলেটি প্রোগ্রামে না বসে নিজের রুমে বসে আছে। বাবা বারবার তাকে ডাকছেন কিন্তু আসছে না। এক সময় বাবা ছেলের এক বন্ধুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন ছেলেকে আনতে। ছেলেটি এবার এসে সকলের সামনে বাবাকে একটি ধমক দিয়ে বলে গেল "বারবার ডাকছো কেন"? তারপর সে প্রোগ্রামে না বসে আবার তার রুমে চলে গেল, বাবা কিছুই বলতে পারলেন না। এই ঘটনায়ও সন্তানের কোন দোষ নেই, সে ছোটবেলা থেকে ইসলামিক গাইড পায়নি। এখন তাকে জোর করে একদিন ইসলামিক প্রোগ্রামে বসিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে লাইনে আনা যাবে না। বিষয়টা একদিনের না।

এমন অনেক মা-বাবা আছেন যারা তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলেননি কিন্তু সন্তান বড় হবার পর তাকে সঠিক বানাতে চান, ইসলামের পথে আনতে চান। সন্তানকে ইসলামের পথে আনতে চেয়ে সন্তানকে জোর করে হাজ্জে পর্যন্ত পাঠান এই আশায় যে, হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সন্তান ভালো সন্তান হয়ে যাবে। অথচ হাজ্জে যাবার সময় ঐ সন্তান ওযুর ফরয কয়টি তাও জানে না, ফরয গোসলের নিয়মও জানে না, সলাতে শুধু উঠা বসাই করতে জানে। যে সকল মা-বাবাদের সন্তানরা এখনো শিশু, তারা অবহেলা করে নিজ জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতা নেবার সাহস যেন না করি। এখুনি সচেতন হই।

তাই সকল মা-বাবাদের প্রতি অনুরোধ, আমরা আমাদের সন্তানদের যদি ভাল চাই তাহলে তাদের পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরকেও ভাল হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদেরকে গাইড করার পাশাপাশি নিজেদেরকেও ইসলামিক গাইড অনুযায়ী চলতে হবে। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি নিজেরাও নিয়মিত পড়াশোনা করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কারণ আমরা নিজেরা যদি সঠিক পন্থায় না চলি, কুরআনের দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে জীবনযাপন না করি তাহলে শুধু সন্তানদের ভাল চাওয়ায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে না।

পিতা-মাতার প্রধান চাওয়া ও প্রত্যাশাগুলোকে কয়েকটি মূল ধাপে ভাগ করা যায়:

আদর্শ চরিত্র গঠন: পিতা-মাতার পরম চাওয়া হলো সন্তান যেন সৎ, বিনয়ী, সত্যবাদী এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।এক্ষেত্রে নিজের আচরণ হতে হবে অনুকরণীয় ও পালণীয়।সন্তানের কাছে নিজেকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

সুশিক্ষা ও আত্মনির্ভরশীলতা: প্রত্যেক পিতামাতাই চান সন্তান যেন দুনিয়াবি ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়।এজন্য সন্তানের শিক্ষার মূল কার্যক্রম শুরুর সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। আদর্শ ও নৈতিকতা শেখানোর জন্য এর বিকল্প নেই।

সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: সন্তানের সুস্থ ও নিরাপদ জীবন প্রতিটি বাবা-মায়ের প্রধান অগ্রাধিকার।শৈশবকাল থেকে শুরু করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া পর্যন্ত সন্তানেরা থাকে অসহায়। তাই তাদের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক মা- বাবার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ: বাবা-মায়ের চাওয়া, সন্তান যেন পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে এবং সমাজের একজন ভালো মানুষ হিসেবে অবদান রাখে।সেক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে তারা নিজেরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজের একজন ভালো মানুষ হিসেবে কতটুকু দায়িত্ব পালন করে এটা প্রতিপাদ্য বিষয়।

ধর্মীয় অনুশাসন: বাবা-মায়েরা সবসময় চান সন্তান যেন নিজ ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে এবং ধার্মিক হয়।এর পূর্বে নিজের জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কাম্য।

বেশীরভাগ মা-বাবার ভুল ধারণা

যদি মনে করি যে ভাল স্কুলে বা ভাল কলেজে বা ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেই আমি চিন্তা-মুক্ত, এখন কেবল সন্তানের ভাল রেজাল্ট আর ভাল চাকুরীর অপেক্ষা, আর এভাবেই আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হবেন। এভাবে একমুখী (ওয়ান ওয়ে) চিন্তা করলে আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ এখনকার স্কুল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে নীতি নৈতিকতা শেখানো হয় যা ইসলামের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মা-বাবাদের মধ্যে কোন কোন সময় একটি ভুল হিসেব কাজ করে। আমরা মনে করি আমার সন্তান সবসময় আমার কথা শুনবে। এটা সবসময় ঠিক নয়। আমার সন্তান এক স্বাধীন সত্তা। তার নিজস্ব অভিরুচি, ধ্যানধারণা, কল্পনা শক্তি, বোধশক্তি, পছন্দ-অপছন্দের স্বতন্ত্র তালিকা রয়েছে। আমি চাইবো আর সে তা মেনে নেবে এটা সবক্ষেত্রে আশা করা ঠিক নয়। সুতরাং তার জন্য মা-বাবাদের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাকে কেবল ভাল হওয়ার Theory শিক্ষা দেয়া যাবে না। সাথে Practical ও করাতে হবে। নিজে একটি ভাল কাজ করে তাকে তা উপলব্ধি করার সুযোগ দিতে হবে।

যেমন: আমার গরীব আত্মীয়ের খোঁজ খবর যেন নেই। সামর্থানুযায়ী তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করি। সন্তানকেও এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলি। নিজে ঘরে ঢুকার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করি। সন্তানকে প্রতিদিন সালাম দেই। আমাদের সমাজে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভুল প্রত্যাশা হলো ছোটদের কাছ থেকে সালাম আশা করা। এটা এক জঘন্য বিকৃতি ও সত্যের খেলাফ। আসলে সালামের মাধ্যমে আমি দু'আ করি। আমি তো চাই সন্তানের কল্যাণ। সুতরাং সন্তানকে দেখা মাত্রই যেন সালাম দেই। তাহলে সে খুব সহজে শিখে নেবে। রসূলুল্লাহ সাঃ বেশী বেশী সালামের প্রচলনের জোর তাগিদ দিয়েছেন। এতে করে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সম্মান বৃদ্ধি পায়।

ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। আমার যদি দ্বীন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো?
কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ভাসাভাসা দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের আর বুঝ দিতে পারবো না।

আমাদেরকে কিছু কুরআনের তাফসীর, সহীহ হাদীস গ্রন্থ, হারাম-হালালের বিধান সম্বলিত বই, কিছু ইসলামী সাহিত্য, রাসূল (সা:)-এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী ইত্যাদি জোগাড় করে অধ্যয়ন করে নিতে হবে। তাহলে পরবর্তী জেনারেশনকে দ্বীনের চির-আধুনিক চিত্রটি তুলে ধরা সম্ভব হবে। তা না হলে আমাদের এই চরম সীমাবদ্ধতা ও কেবল বাপদাদার রসম রেওয়াজের জ্ঞান দিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের দ্বীন হতে দূরে ঠেলে দেবো। আসুন জ্ঞানের সবচাইতে বিশুদ্ধ মাধ্যম কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে যাবতীয় সবকিছু জানার ও বুঝার চেষ্টা করি। এভাবে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবো। জীবনকে নতুনভাবে উপভোগ করতে পারবো। তখন উপলব্ধি হবে যে জীবন মানে কেবল সকালে ঘুমঘুম চোখে অফিসে দৌড়ানো নয়। জীবন মানে কেবল সংসারের ঘানি টানা নয়। জীবন মানে শুধু অর্থ কামাই করাই নয়। এর বাইরে জীবনের বিশাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে। সেগুলি আরো আনন্দদায়ক, আরো চ্যালেঞ্জিং, আরো কালারফুল। তখন বুঝবো আসল মানবপ্রেম কাকে বলে। দেখবো দুনিয়াটা কতগুলি সূদী মহাজনের নেতৃত্বে চলছে। বুঝবো তারা আমাদের যে মূল্যবোধ গিলাচ্ছে তা কতগুলি অখাদ্য আর কুখাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ রয়েছে আল কুরআনে। মানুষ পরিচালনার জন্য রয়েছে উন্নত মানবিক পদ্ধতি। তখন আফসোস করবো বর্তমানের অর্থহীন বস্তুপূজার জন্য। সময় নষ্ট করার অভিযোগে নিজেকে তিরস্কার করবো। দ্বীনের বিশাল এ নিয়ামত হতে বঞ্চিত করার জন্য নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করবো। কেবল ৫৬ মার্কস পেয়ে পাশ করার ছোট মনের চিন্তা হতে বেরিয়ে লেটার মার্কস পেয়ে আল্লাহর প্রিয় হবার

লোভনীয় বাসনা জাগবে। দেখবো জীবনের রুটিন ও স্টাইল আগাগোড়া পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমিন।

আমরা সন্তানদের সবসময় ছোট মনে করি।
আমার সন্তান একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা। মা-বাবাদের একপেশে স্বভাব হলো সন্তানদের সবসময় ছোট মনে করা। আমরা প্রায় এরকম মন্তব্য করি যে,আমার ছেলে এখনো অল্প বয়স্ক, সে আর একটু বড় হোক তারপর নিয়মকানুনের ব্যাপারে কঠোর হওয়া যাবে। আমরা মা-বাবারা মনে করি সন্তানগণ সবসময় আমাদের কথা শুনবে। এ একটি ভুল ধারণা। আমার দৃষ্টির আগোচরে সন্তানগণ বড় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন টের পাওয়া যাবে যে সে আর আমার কথা শুনছে না। আমার যৌক্তিক দাবীগুলিও মানছে না। আমাকে হেয় করা শুরু করেছে। তখন আর কিছু করার সময় থাকবে না। পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কোন মূল্যবোধে যদি আমি বিশ্বাস করি তাহলে সেগুলিতে ছোটকাল হতেই অভ্যাস করাতে হবে।

বিত্তবান মা-বাবাদের অবস্থা আরো করুণ। তাদের জন্য আফসোস। যে অর্থের পেছনে ছুটে তারা সন্তানদের সময় দেন না, পরবর্তীতে সে অর্থকে অনর্থের মূল বলে মনে করতে থাকেন। বেলাশেষে আফসোস করেন কিন্তু তখন বেশ দেরী হয়ে যায়। বিত্তশালী পরিবারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে ক্ষতি করেন। কিন্তু শেখার এ সময়টিতে মা-বাবারা সন্তানদের প্রাচুর্যে ভাসিয়ে দেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। কঠিন অবস্থায় নিজেকে সামলিয়ে চলার শিক্ষার অভাবে সে খেই হারিয়ে ফেলে।

কিছু পারিবারিক নিয়ম থাকা উচিত

ভুক্তভোগী মা-বাবারা নিজেদের বিষয়গুলির ব্যাপারে যতটা আপোস করেন তার চাইতে বেশী আপোস করেন সন্তানদের বিষয়াদিতে। আর খারাপ কাহিনীর শুরু এখান হতে । প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণে আপোস, পারিবারিক মূল্যবোধ ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবহেলা, সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে একেবারে লাগামহীন স্বাধীনতা দান, করণীয়সমূহের লিষ্টে ধর্মীয় শিক্ষাদানকে সবকিছুর পেছনে রাখা, মা-বাবাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন থাকা, সন্তানদের আলাদা সত্তার স্বীকৃতি না দেয়া, সন্তানদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়া ইত্যাদি হলো পরিবার নামক দেহে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ। প্রত্যেকটি পরিবারের কিছু অলিখিত মূল্যবোধ বা ঐতিহ্য রয়েছে। পরিবারের কর্তাগণ যদি সে মূল্যবোধগুলির ব্যাপারে মনোযোগী হন তাহলেই একটা বড় ধরনের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় । যেমন কোন কোন পরিবারে এ নিয়ম রয়েছে যে স্কুল পড়ুয়া সন্তানগণ কোন অবস্থাতেই অনুমতি ছাড়া মাগরিবের পর ঘরের বাইরে থাকতে পারবে না। এটিও কম নয়। এ বিষয়টিও এমন যে আমেরিকার সরকার কোন কোন অঙ্গরাজ্যে কার্ফিউ জারী করে স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ঘরের ভেতর থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এ সংক্রান্ত গবেষণায় ৫৩৪টি আমেরিকান শহরে সান্ধ্যকালীন কারফিউ সম্পর্কে জনতার যে মতামত পাওয়া গেছে তা এই : শতকরা ৯৭ ভাগ শহরবাসী বলেছেন কারফিউর ফলে শিশু অপরাধ অনেক কমেছে; ৯৬ ভাগ বলেছেন কারফিউর কারণে ফাঁকিবাজী কমেছে; ৮৮ ভাগ বলেছে কারফিউ মাস্তানি কমিয়েছে; কারফিউর ফলে ৫৬ ভাগ শহরে বড় ধরনের অপরাধ কমেছে। অতএব আমার পরিবারে যদি এ ধরনের কোন ঐতিহ্য থেকে থাকে তাহলে তা শিথিল যেন না করি। বরং আরো কড়াকড়িভাবে সন্তানদের এ নিয়ম পালনে উৎসাহিত করি। তারা যদি এ নিয়ম পালন করে তাহলে পুরস্কৃত করতে পারি।

পারিবারিক শিক্ষা একজন মানুষের ভিত তৈরী করে। এ শিক্ষা এত শক্তিশালী যা একজন ব্যক্তির সারাজীবনের জন্য দিক নির্দেশনার কাজ করে। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন সকালে নাস্তার টেবিলে সম্ভব হলে দুই ঘন্টা সময় নিয়ে বসা উচিত। সাথে পরিবারের সকল সদস্য। স্ত্রী, সন্তান ও অন্য কেউ যদি থেকে থাকে,সকলকে নিয়ে সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে নাস্তা শুরু করা যেতে পারে। পারিবারিক বিষয় আলোচনা করা

যেতে পারে। খোলামনে, আন্তরিকতার সাথে। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে কোন সমস্যা আছে কিনা। সন্তানদের একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

এরপর কুরআনের তাফসীর নিয়ে বসা যেতে পারে। সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু। সূরা ফাতিহার সরল অর্থ সবাইকে শুনানোর পর এর তাফসীর শুরু করতে হবে। সকলকে প্রতিটি আয়াতের অর্থ ও এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক এক করে শুনানো যেতে পারে। জিজ্ঞেস করতে হবে কারো কোন কিছু যোগ করার আছে কিনা। সকলকেই বলার সুযোগ দিতে হবে। তারপর সূরা ফাতিহার শিক্ষা বাস্তব জীবনের আলোকে মিলানোর চেষ্টা করতে হবে। এ কাজটি প্রতি সপ্তাহে করতে হবে। একেক সপ্তাহে একেক সূরা নিয়ে আলোচনা হবে। পারিবারিক বৈঠকের উদ্দেশ্য থাকবে পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আদর্শ পরিবার গঠন।

সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের কর্তব্য:
অতি ছোট অবস্থা হতে সন্তানদের লালন-পালনে মায়ের উপস্থিতি ও সঙ্গ খুবই প্রয়োজন। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতার গুরুরা মহিলাদের সমঅধিকারের কথা বলে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এতে কোন কোন শিক্ষিতা মহিলা শুধুমাত্র ঘর-সংসার করাটাকে সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করে থাকেন। এটি একটি সামাজিক উম্মাদনা ও শোষণ। আর মহিলারা নিজেদের স্বকীয়তা ভুলে কেবল প্রচারণা আর অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে একই শ্লোগান শুরু করেন। তারা ঘরে থাকাটাকে অপেক্ষাকৃত নীচু কাজ মনে করেন। এতে কয়েকটি ধীরগতির বিপর্যয় শুরু হয়। একটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজন শিশু সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজন মা শোষিত হন (যদিও তিনি তা মনে করেন না)। পরিণতিতে সমাজের সকল শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে পশ্চিমা সংস্কৃতি এ সমঅধিকার নামক আগুনের স্রষ্টা তারাই আবার প্রমাণ করছে যে শিশু সন্তানগণ মায়ের অনুপস্থিতি-তে চরম মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি উন্নত দেশ যেখানে শতকরা সর্বোচ্চ হারে মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি সর্বত্রই কাজ করে, সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়ে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছে।

দুই হাজার শিশুর উপর জরিপ চালানো হয়। এ জরিপ চলে টানা তিন বছর ধরে। এতে দেখা যায়, যেসব শিশু দিনভর তাদের মা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা লালিত-পালিত হয়, যেমন: ডে কেয়ার সেন্টার, মেইড ইত্যাদি তাদের সার্বিক বেড়ে উঠা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ। Doctor Bernadine Woo (যিনি এ জরিপ পরিচালনা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন) বলেন, দিনের সিংহভাগ সময় মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশুরা যথাযথ মনস্তাত্বিক সাপোর্ট পায় না, ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকমত গড়ে উঠে না। Institute of Mental Health-এর Deputy Chief Dr. Daniel বলেন, শিশুদের দেখাশুনার জন্য প্রথম ৬ বছর একজন সঙ্গী বা তদারককারী দরকার যিনি নিয়মিত/সার্বক্ষণিক শিশুর পরিচর্যা করবেন, শিশুকে সঙ্গ দেবেন ও তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আর এটি সম্ভব মাকে দিয়ে। এ জরিপে আরো বলা হয়, শিশুদের মনস্তত্ব দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তারা একেক সময় তারা একেক সময় একেকজনকে মূল পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখতে পায়।
ফলে অন্যদের তুলনায় তারা নিম্ন IQ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তিনগুণ।
এটি মাত্র একটি জরিপের ফলাফল। এ ধরনের সকল জরিপ একই কথা বলে। মূল কথা একটাই। শিশুদের পরিচর্যার জন্য মায়ের কোন বিকল্প নেই। এখন সিদ্ধান্ত আমার। আমার শিশুর অধিকার রক্ষা করে তার সার্বিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখবো নাকি বাইরে চাকুরী করে সংসারের স্টেটাস ঠিক রাখার জন্য টাকা কামাবো?

মহিলাদের চাকুরী করার কারণে সংসারে উপরি আয় হয়। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচক উর্ধে উঠে। ঘরে ও বাইরে যন্ত্র আর বাহ্যিক চাকচিক্যের সমাগম ঘটে। কিন্তু এরজন্য যে মূল্য দিতে হয় তা কি একেবারে কম? সর্বপ্রথম এ বিষয়টি মহিলারা বুঝেন না যে, চাকুরী করে তারা শোষণের শিকার হচ্ছেন। পুরুষরা চাকুরী করে একটি। তাদের প্রাকৃতিক স্বভাবই ঘরের বাইরের কর্মচাঞ্চল্য। শতকরা ১জন পুরুষও পাওয়া যাবে না যিনি সারাদিন অফিস বা ব্যবসায়ের কাজ করে ঘরের কাজে যথাযথ ভূমিকা পালন করে স্ত্রী ও পরিবারকে সহায়তা করছেন। কেউ কেউ আবার যুক্তি দেখান যে পুরুষরা বাহির হতে বাসায় এসে ক্লান্তশ্রান্ত দেহে ঘরের কাজে সহযোগিতার শক্তি থাকে না।

এবার আসি স্ত্রীদের কথায়। স্ত্রীগণ কোন অবস্থাতেই নিজ বাসার সার্বিক দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারবেন না। স্ত্রী যত বড় চাকুরীই করুক না কেন, বাইরে যত ব্যস্ত সময়ই কাটান না কেন, তিনি সন্তান পালন, রান্না, তার ঘরের সৌন্দর্য রক্ষা, বাসা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সার্বিক অবস্থার দেখভাল করার সহজাত মানসিকতা হতে কখনো মুক্ত হতে পারবেন না। এবার দেখি, পুরুষ কয়টি চাকুরী করছেন আর স্ত্রী কয়টি চাকুরী করছেন? পুরুষ আসলে চাকুরী করছেন একটি। আর স্ত্রী করছেন তিনটি। একটি অফিসের চাকুরী, একটি ঘর দেখাশুনার সার্বিক চাকুরী, আরেকটি সন্তানদের দেখাশুনার চাকুরী। এটি কি নারী শোষণ নয়?

অতএব সন্তানের মা যাই করেন না কেন, সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যদি তিনি কাছে থাকতে না পারেন তাহলে এটা একটা বিরাট অবিচার। সন্তানদের সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য, প্রকৃত শিক্ষালাভের স্বার্থে, একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে মাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সন্তান লালন-পালন: মা-বাবার কিছু করণীয়:

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি

ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? সূরা নাহল (১৬): ৭২

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ণ। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছে:

ينهِ مُلْكُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। সূরা শুরা (৪২): ৪৯-৫০

সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই, বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন।

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।সূরা আনফাল (৮): ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন।

واعلموا أيها المؤمنون إنما أموالكم التي حولكفوها الله وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء، أعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন।

ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم ..... ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা

ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحظها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।সকল খিয়ানতকারীর বিরুদ্ধে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সূরা
ইসরা (১৭): ৬৪

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে

অংকিত নকশা।' সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

এই প্রবন্ধে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে:

এক. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা।

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফের ইরশাদ:

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা (-মাতা)র দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমন

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। সূরা ইবরাহীম (১৪): ৩৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেন

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। সূরা ইবরাহীম (১৪): ৪০
মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য

তার মা দুআ করেছিলেন

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ... وَإِنِّي سَنَيْتُهَا مَرْيَمَ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল.... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। সূরা আলে ইমরান (৩):

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে
সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدعاء

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। সূরা আলে ইমরান (৩): ৩৮

তিনি আরো দুআ করেন হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং বলেন:

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে আপনার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। সূরা মারইয়াম (১৯):

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّٰلِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। সূরা আসসাফ্ফাত (৩৭): ১০০

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন :

رَبِّ إِن نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। সুরা আলে ইমরান (৩): ৩৫

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। সুরা ফুরকান (২৫): ৭৪

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

দুই. শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেন:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও

আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিকতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল

كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي يعرب أول ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله । মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।

তিন. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী? এখানে আমরা এর দু'টি নমুনা পেশ করছি:

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। Ñতাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে:

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেইÑ এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ : يُبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। সূরা লুকমান (৩১): ১৩

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ। বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেনÑ সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يُبْنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। সূরা লুকমান (৩১): ১৬

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ। নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يُبْنَى أَقِمِ الصَّلوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। সূরা লুকমান (৩১) ১৭

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা লুকমান (৩১): ১৮

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.۔

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। সূরা লুকমান (৩১): ১৯

লুকমান হামীক তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন:

يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن!

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك.

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة.

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يَنفَعُوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رفعت الأقلام وجفت الصحف.

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।)

অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.

স্বারণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

লক্ষ করুন, একেকটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন।

নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হল: শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর 'ইয়া গোলাম' বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন 'এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।' এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবক'টি নসীহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে তা হল শিশুকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের লাভের বিবরণ দেওয়া। যাতে নিজ আগ্রহে সে কাজটি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে এর লাভ বলেছেন যে, এতে করে আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবেন, তোমার সাহায্য করবেন।

তথাপি শিশুকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ কাজের ক্ষতির দিকটাও আলোচনা করা। এতে করে শিশুর মনে মন্দ স্বভাবের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

লুকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলো আবার একটু লক্ষ করুন, যে কয়টি কাজ থেকে তিনি সন্তানকে বিরত রাখতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটির সাথে ঐ আচরণের মন্দ দিকেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

শিরক সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। অহংকারের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উঁচু কর্কশ আওয়াজের ব্যাপারে বলেছেন: নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর।

সুতরাং আমরা শিশুদের প্রতি শুধু ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেই থেমে যাব না; বরং এর সাথে ভালোর লাভ ও মন্দের ক্ষতির কিছু কিছু দিকও তার সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীক দানকারী।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হল আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, আব্বু! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামায পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন সত্য কথা বল, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খেদমত কর, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন মিথ্যা বল না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারায হবেন।

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

খুব ছোট অবস্থা হতে সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। তাদের জাগতিক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেও আমি দায়িত্বশীল। কেবল ভাল স্কুলে ভর্তির স্বপ্ন দেখবো আর ভাল রেজাল্ট করার জন্য এ আমানত আমাকে দেয়া হয়নি। আমার উপর আমার সন্তানের অধিকারের মধ্যে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সন্তানের ভুল শিক্ষার জন্য মা-বাবার দায়-দায়িত্ব এড়ানোর কোন উপায় নেই।

একজন বাবা বা মা তার সন্তানকে যে মূল্যবোধে বড় করেন সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠে। সন্তানের মানসিকতা, পছন্দ, অপছন্দ, ত্যাগের শিক্ষা, অন্যদের প্রতি মমত্ববোধ, সততা, আল্লাহকে চেনা, পরকালের ধারণা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে মা-বাবার করণীয় অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে তাদের মুক্তি নেই। সম্পূর্ণ অসহায় একটি শিশুকে এর স্রষ্টা এমন দু'জন মানব-মানবীর নিকট আমানত হিসেবে পাঠান যারা সামর্থবান, যাদের সহায়-সম্বল দেয়া হয়েছে, যাদের বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, যাদের

ভালমন্দের জ্ঞান আছে। শিশু ভূমিষ্ট হবার পর তার সকল দায়-দায়িত্ব মা-বাবার উপর বর্তায়। এবার চিন্তা করি আমার এ শিশুকে কী শিক্ষা দেয়া উচিত? কোন ভাবাদর্শে আমি তাকে গড়ে তুলবো? এ শিশুর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে? তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি হবে? কোন মৌলিক উপাদান দিয়ে তার চিন্তা-চেতনাকে গড়ে তুলবো?

আমি যেখানেই থাকি না কেন ইসলামী মূল্যবোধ আজকাল সর্বত্রই অনুপস্থিত। সকলে কেবল একটি মূল্যবোধে উজ্জীবিত, সেটি হলো কৃত্রিম Status-এর মূল্যবোধ। ঢাকা শহর বলি আর গ্রাম-গঞ্জ বলি মৌলিক বোধ আজ সবখানেই
এক এবং একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং আমি কোথায় আছি তাতে তেমন কোন কিছু যায় আসে না।

সর্বপ্রথম জেনে নেয়া উচিত যে, আমার সন্তান একটি স্বতন্ত্র সত্তা। বড় হয়ে সে তার নিজের হিসাব নিজে দেবে। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন আমাদের পারস্পরিক বন্ধন কোন ইতিবাচক কাজে আসবে না বরং নেতিবাচক কাজে আসার সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ যে সন্তানকে আল্লাহর হুকুম বিরোধী কাজকর্মে নিয়োজিত করেছি সে সন্তানই আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। আখিরাতের আদালতে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাবো, দিশা হারিয়ে ফেলবো যখন দেখবো আমাদেরই প্রিয় সন্তান আমাদের অন্যায় কাজগুলি প্রমাণসহ দেখিয়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট বিহিতের ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তাঁর কুরআনে জানাচ্ছেন:

"সর্বশেষে যখন সে কান-বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হাজির হবে), সে দিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা ও বাবা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য করার মত অবস্থা থাকবে না।" (সূরা আবাসা: ৩৩-৩৭)

উত্তম উপদেশ প্রদান

সন্তানের জীবদ্দশায় সৎচরিত্র গঠন, আদর্শ শিক্ষা অর্জন, দ্বীনী হুকুম-আহকাম ভিত্তিক অভ্যাস গঠনের লক্ষ্যে উত্তম নসীহত প্রাপ্তি সন্তানের অধিকার। আসলে এমন অধিকার জগতের প্রত্যেক মা-বাবাই আদায় করতে চেষ্টা করেন।

অনেক সময় সন্তানরা মা-বাবার আদেশ নিষেধ ভুলে গেলে বা পালন করতে দেরী করলে মা-বাবারা রাগ করেন, নতুন করে জানতে চাইলে বলেন- এখন আর বলতে পারব না। এত বলতে হবে কেন? এখন বয়স হয়েছে না, বড় হয়েছে না, নিজে বুঝে না অথবা বকা দিয়ে বলে বেয়াদব, বদমায়েশ, অসভ্য, যা এখান থেকে বেরিয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা, আর আসবি না, তুই মর, জাহান্নামে যা ইত্যাদি। এখানে এ কথাগুলো পবিত্র কুরআন এর একটি দৃষ্টান্ত থেকে উলেখ করা যাক:

কুরআনে আল্লাহ সলাত কায়েম করার কথা ৮০ বারেরও বেশী বলেছেন। একবার দু'বার নয়। যদি আল্লাহ একবার দু'বার বলে রাগ করতেন, আর না বলতেন বা আমাদের মত বকাবকি করতেন তাহলে না হয় ভাবতাম আমাদের নীতি ঠিক আছে; কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন অনেক বার। তবু রাগ করেননি। তারপরও যখন আমরা ঠিকমত সলাত আদায় করি না তবুও তো তিনি বকা দেন না, এ দুনিয়া থেকে বের হয়ে যেতে তো বলেন না, আলো-বাতাস থেকে আমাদেরকে এক সেকেন্ডের জন্যও বঞ্চিত করেন না।

রাগ মানুষের একটি খারাপ প্রবৃত্তি। রাগের সময় মানুষ এমন অনেক অন্যায় কাজ করে বসে যা সে অন্য সময় করতে পারতো না। পরে আফসোস করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। আল্লাহর কোরআনে মুত্তাকিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ক্রোধ সংবরণ করা, মানুষকে ক্ষমা করা। আল্লাহ বলেন, তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য; যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং

মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (সুরা আলে ইমরান: ১৩৩, ১৩৪)

কোরআনের আরেকটি আয়াতে মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়। (সুরা শুরা: ৩৭)

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি রাগের সময় ক্ষমতা থাকার পরও নিজেকে সংযত করে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে সবার সামনে ডেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন। (সুনানে আবু দাউদ) আরেকটি হাদিসে নবিজি (সা.) বলেছেন, কুস্তি লড়ে অন্যকে ধরাশায়ী করার চেয়ে বেশি শক্তি ও বীরত্বের কাজ রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করা। (সহিহ বুখারি)

কোরআন ও হাদিসে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার বা রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখার কিছু পদ্ধতিও শেখানো হয়েছে। আমরা এখানে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করলাম:

১. আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

শয়তানের প্ররোচনায় রাগ উঠে গেলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وأمر بالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهْلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দাও আর মূর্খদের এড়িয়ে চল। আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত কর, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সুরা আরাফ, ১৯৯, ২০০)

কোরআনের ব্যাখ্যাকাররা বলেছেন, আয়াতে শয়তানের প্ররোচনা অর্থ রাগ বা ক্রোধ যা শয়তানের পক্ষ থেকে উস্কে দেওয়া হয়।

হাদিসেও এসেছে, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগের সময় 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রাজিম' পড়ে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি: ৩২৮২, সহিহ মুসলিম: ২৬১০)

২. অজু করা

আরকটি হাদিসে রাসুল (সা.) রাগের সময় অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল (সা.) বলেন, রাগ আসে শয়তান থেকে, আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। আগুন পানি দিয়ে নেভাতে হয়, তাই রেগে গেলে তোমরা অজু করো। (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৮৬)

অজু করাও রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি।

৩. নিষ্ক্রিয় ও চুপ হয়ে যাওয়া

রাগ নিয়ন্ত্রণের আরেকটি পদ্ধতি হলো, নিষ্ক্রিয় ও চুপ হয়ে যাওয়া। রাগের মাথায় কোনো কথা বলা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকা। দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়া, বসে থাকলে শুয়ে পড়া। আবু জর গিফারি (রা.) বলেন, নবিজি (সা.) আমাদের বলতেন, তোমরা দাঁড়ানো অবস্থায় রেগে গেলে বসে পড়ো। এরপরও রাগ না কমলে শুয়ে পড়ো। (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৮৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।' (মুসনাদে আহমদ: ৪৭৮৬)

উত্তম ব্যবহার শিক্ষা দান

রসূল বলেছেন: কোন বাবা তার সন্তানদের উত্তম আচার-ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভাল কোন জিনিস উপহার দিতে পারে না। (তিরমিযী)

সন্তানদেরকে উত্তম আচার-ব্যবহার শিক্ষাদান একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন: অনেক ছেলেমেয়েরাই ফোন রিসিভ করে সালাম দেয় না। মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলে না। মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে ঝগড়া বা তর্ক করে, রুঢ় ভাবে কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যেন মনে না করি যে তারা আদব-কায়দা ক্লাসের বই পড়ে শিখবে বা স্কুল টিচাররা শেখাবেন। মনে রাখা উচিত এখনকার অধিকাংশ স্কুলগুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে যেখানে আদব কায়দা শেখানো হয়। বরং আজকাল টিভি দেখে সন্তানরা এমন আচরণ শিখছে যা আমাদের ইসলামিক কালচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই আমার সন্তানকে আদব-কায়দা আমাকেই সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেক পরিবার ইসলামিক মাইন্ডের কিন্তু সন্তানেরা আদব-কায়দা জানে না কারণ তাদের সেটা শেখানো হয়নি। আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন: কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলাও একটা সদাকা।

একটি সুন্দর প্ল্যান করে বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সাথে শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। খানা-পিনা, উঠা-বসা, ঘুম ও জাগরণের আদব শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব, মসজিদ-স্কুলের আদবের কথা তাদের বলতে হবে। পাক-পবিত্রতার আদব, স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার আদব, চলাফেরা এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে উঠা-বসার আদব, গৃহের এবং নিজের জিনিসসমূহকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিতে হবে এবং একটি সভ্য ও পবিত্র জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে আমাকে তার অভিভাবকত্ব করতে হবে। একবার শুধু কোনো ভালো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণই যথেষ্ট নয় বরং প্রশিক্ষণের দাবী হলো যে, আমি সে ব্যাপারে অব্যাহতভাবে দৃষ্টি রাখবো এবং বারবার ভুল সত্ত্বেও বিরক্ত হবো না। ধৈর্য ও সবরের সাথে এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে শুধরে দিতে থাকবো এবং সামান্যতম ভুলকেও তুচ্ছ মনে করবো না।

সন্তানকে উত্তম ব্যবহার ও শিষ্টাচার শিক্ষাদান পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার বা আদব শিক্ষা দেওয়া দান-খয়রাত করার চেয়েও উত্তম" (তিরমিজি)।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তানকে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষাদানের কার্যকরী কিছু দিক নিচে দেওয়া হলো:

১. আচরণের মাধ্যমে শেখানো (সর্বোত্তম আদর্শ): শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। পিতা-মাতা নিজেরা যেমন আচরণ করবেন, সন্তানও তাই শিখবে। হাদিসে এসেছে, "প্রত্যেক নবজাতক স্বভাবজাত ধর্মে জন্ম নেয়, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজকে পরিণত করে" (বুখারি)।

২. পারিবারিক শিষ্টাচার ও সালামের প্রচলন: পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়ার অভ্যাস ছোট থেকেই গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ-যা আল্লাহর নিকট হতে পবিত্র ও কল্যাণময়" (সূরা আন-নূর: ৬১)।

৩. অপরের সাথে বিনয়ী ও মার্জিত কথা বলা:
কুরআনে লোকমান (আ.)-এর মাধ্যমে পিতা-মাতাকে সন্তানদের নম্রতা ও ভদ্রতা শেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো" (সূরা লুকমান: ১৯)।

৪. সত্যবাদিতা ও আমানত রক্ষা: সন্তানকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা এবং সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস করানো ঈমানের অঙ্গ। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র হাদিস অনুযায়ী, সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়।

৫.পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশিকা:
সন্তান যেন অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তার শুরুটা হতে হবে পিতা-মাতার সাথে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমার পালনকর্তা আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো" (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩)।

৬. অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দিতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়" (তিরমিজি)।

দুষ্টামী আর বেয়াদবী এক নয়

শিশুরা দুষ্টামী করবে এটিই স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক। তারা দৌড়াদৌড়ি করবে, ছুটাছুটি করবে, খেলবে, লাফাবে, বল ছুড়ে মারবে, হৈচৈ করবে, দেয়ালে দাগাবে, ফ্লোর নষ্ট করবে, পানি দিয়ে খেলবে, রং দিয়ে খেলবে, কিচেনের হাড়ি-পতিল এনে খেলবে, মা-বাবার জামা-কাপড় পরে খেলবে, মা-বাবা সলাতে সিজদায় গেলে তাদের ঘাড়ের উপরে উঠবে ইত্যাদি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোন কোন শিশু এই বিষয়গুলোতে বেশী একটিভ, আবার কোন কোন শিশু কম একটিভ। শিশুদের এই কাজগুলোতে বাধা দেয়া ঠিক না, এতে তার প্রতিভা প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে। যে সকল শিশু এই কাজগুলোতে বেশী একটিভ তাকে ভুল বুঝে বেয়াদব মনে করা যাবে না, তাকে চড়-থাপ্পড় দেয়া যাবে না। কারণ বেয়াদবী আর দুষ্টামী এক জিনিস নয়।

সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা

আমরা আমাদের সন্তানদেরকে খুবই ভালবাসি। এই ভালবাসার নমুনাস্বরূপ তাদেরকে অনেক সময় অকর্মণ্য করে ফেলি। অনেক পরিবারে ছোটবেলা হতে সন্তানদেরকে নিজ হাতে এক গ্লাস পানি ঢেলেও খেতে অভ্যস্ত করেন না। মেয়ে হাই-স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু একটি ডিমও ভেজে খেতে পারে না। সন্তানদের সব ধরনের কাজ করার অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যেন বলতে না হয়, “আমার বাচ্চারা তো কিছু পারে না!" এটা ঠিক না, তাদেরকে চেষ্টা করতে দিতে হবে, প্রথমে ভুল করবে, কিছু জিনিস নষ্ট করবে, খুব বেশী সুন্দর হয়ত হবে না- তারপর একসময় ঠিকই পারবে ইনশাআল্লাহ। আসুন এ বিষয়ে সতর্ক হই, সন্তানদেরকে ছোট হতে ঘরের কাজে ট্রেইনআপ করি। শিক্ষণীয় হিসেবে দু'টি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

চিত্র এক : ২০০৭ সালে আমরা সপরিবারে লন্ডন গিয়েছিলাম ইষ্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। ইষ্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্টের বাসায় আমাদের দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত ছিল। যা হোক আমরা 12026, 09:46 বাসায় যে দৃশ্য দেখলাম তা হলো, প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাই স্কুল পড়ুয়া ছেলেটা রান্না ঘরে হাড়ি-পাতিল-প্লেট-গ্লাস ধুচ্ছে, ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে এবং বাথরুম পরিষ্কার করছে।

চিত্র দুই: NICAS Canada-র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের বড় ছেলে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমাদের ক্যানাডিয়ান লাইফে এতো ভদ্র ছেলে আমরা কখনও দেখিনি। কী তার অমায়িক ব্যবহার! এছাড়াও সে অসুস্থ বাবার মাথায় পানি ঢালা থেকে শুরু করে মার সাথে ঘরের অন্যান্য কাজকর্মও করে থাকে।

ভারসাম্যপূর্ণ অভ্যাস তৈরী করা

মা-বাবারা সন্তানদের প্রায় সকল সহনীয় দাবী দাওয়া মেনে নিতে চান। এতে আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সহজ করে তুলবে। আমার

সন্তান যদি চা পানে অভ্যস্ত হয় তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু চা পান না করলে তার স্কুলের হোমওয়ার্ক হবে না বা কফি না খেলে তার পড়া হয় না- এ জাতীয় অভ্যাসকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা নিরাপদ। ঠিক তদ্রূপ মাংস ছাড়া আর কিছু তার পছন্দ নয়, বা একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের কাপড় ছাড়া সে অন্য কিছু ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, ইত্যাদি কোন কিছুতে যেন তার দিগন্ত সীমিত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এতে আমাদের সন্তান ফ্লেক্সিবল হয়ে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

যদি সন্তানের ব্যক্তিত্বকে এভাবে গড়ে তোলা যায় তা হলে সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই নিজেকে সামলিয়ে চলতে পারবে। অনেক ছেলেমেয়েদেরকে দেখা যায় মাছ খায় না কাঁটার ভয়ে, শাক খান না কারণ ছোটবেলা হতে শাক খাওয়ায় অনভ্যস্ত। এধরনের অভ্যাস যেন না হয় সেদিকে বাবা-মায়েদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সন্তানদেকে তার নিজের ফর্ম নিজে ফিলাপ করতে দেয়া উচিত। আমার যে কটি গাড়ীই থাক না কেন সন্তানদের মাঝে মধ্যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত করা উচিত। যাতে প্রয়োজনে তারা বিনাদ্বিধায় যেখানে সেখানে যাতায়াত করতে পারে। তবে যদি সন্তানের নিরাপত্তা হারাবার আশঙ্কা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। এ উদাহরণগুলো দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আমার সন্তান যেন বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে না উঠে।

আমরা মা-বাবারা বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই দেই। কিন্তু একটা বাচ্চা কিছু চাইলে তার সাথে আলাপ করা দরকার সে এটা কেন চায়,

এটা দিয়ে সে কি করবে, এর উপকারীতা ও অপকারীতাগুলো কি কি? জিনিসটি আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি'না এবং এই টাকায় সে আর কি করতে পারে? এতে করে ওরা স্বার্থপর হবার পরিবর্তে needs এবং wants এর মধ্যে তফাত করতে শিখবে, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিতে শিখবে।

সবচেয়ে বড় যুলুম:

ইসলামে এবং সামাজিক নীতিতে পিতামাতার স্থান অত্যন্ত উচ্চে হলেও, সন্তানের ওপর যেকোনো ধরনের অন্যায় বা অবিচার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি জুলুম বা অবিচার একটি মারাত্মক সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি।

নিচে পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি সংঘটিত প্রধান প্রধান জুলুমের দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করা

আচরণে পার্থক্য: এক সন্তানকে বেশি ভালোবাসা এবং অন্য সন্তানকে অবহেলা করা।

সম্পদ বন্টনে অন্যায়: ইসলামী বিধান বা প্রচলিত আইন অমান্য করে এক সন্তানকে বেশি সম্পদ দেওয়া এবং অন্যকে বঞ্চিত করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: তিনি
বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ (ন্যায়বিচার) কায়েম করো।" (সহীহ বুখারী)

২.জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া : সন্তানের মতামত বা পছন্দকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

পড়াশোনা ও ক্যারিয়ার সন্তানের মেধা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পড়াশোনা বা পেশা বেছে নিতে বাধ্য করা।

৩. শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন:

অতিরিক্ত মারধর: সামান্য ভুলের জন্য বা রাগের বশে সন্তানকে নির্মমভাবে প্রহার করা।

কটু কথা ও অভিশাপ: কথায় কথায় সন্তানকে অপমান করা, অন্যের সামনে ছোট করা বা ক্ষতিকর অভিশাপ দেওয়া।

ভীতি প্রদর্শন: ঘরে এমন এক ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সন্তান সবসময় আতঙ্কে থাকে।

৪. মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা:

শিক্ষা ও ভরণপোষণ: সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সন্তানের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করা।

উপার্জন কেড়ে নেওয়া: প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের উপার্জিত অর্থ জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে তাকে নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না দেওয়া।

৫. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব:

সঠিক পথ না দেখানো: সন্তানকে ভালো-মন্দের পার্থক্য না শেখানো এবং তাদের পাপাচারের দিকে ঠেলে দেওয়া। এটি সন্তানের ভবিষ্যতের প্রতি এক ধরনের পরোক্ষ জুলুম।

আমরা আমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুলুম যেটা করছি তা হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি যে আমাদের সন্তানদের দু'টি জিনিস (১) দেহ ও (২) আত্মা নিয়েই তাদের গোটা অস্তিত্ব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের দেহের প্রতি এতো বেশী যত্ন নেয়া হয়েছে যে আত্মার দিকে নজরই দেয়া হয়নি। যার কারণে দেহের

অত্যধিক যত্ন নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম অবজ্ঞা করে মন ও আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে।

সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া

মা তার সন্তানকে অবর্ণনীয় কষ্টে গর্ভেধারণ করেন। অমানুষিক কষ্টে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আনেন। তারপর নিজের ভালবাসা আর ত্যাগের সবটুকু উজাড় করে অসহায় একটি শিশুকে যথাক্রমে সুস্থ, সবল, সজ্ঞান ও স্বাবলম্বী করে তোলেন। সন্তান মানুষ করতে গিয়ে মা-বাবাকে যে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় তা শুধু মা-বাবারাই জানেন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এ কষ্ট আরও বেশি। এখানে রোজ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

অভাবের কারণে একজন নবীন মাকেও একহাতে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আর অপরহাতে বুকের ধন সন্তানটিকে আগলে রাখতে হয়। অনেক মা আছেন যারা সময়মত বাচ্চার খাবারটিও যোগাতে পারেন না রুচিমত। বিশেষত যেসব বাচ্চা জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পায় না। দরিদ্র পরিবারে এসব শিশুকে যে কত কষ্টে মা জননী বড় করে তোলেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এ সময় মায়েদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়।

অথচ অনেক মা'কে এ সময় ধৈর্যহারাও হতে দেখা যায়। অনেক মা সন্তানের উপর বিরক্ত হয়ে তাকে অবলীলায় অভিশাপ দিয়ে বসেন।

স্নেহময়ী জননী হয়তো তার জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের যে কোনো অনিষ্ট রোধ করতে চাইবেন। কিন্তু তিনিই আবার রাগের মাথায় অবচেতনে আদরের সন্তানটির অনিষ্ট কামনা করে বসেন। প্রায়ই দেখা যায় সন্তানদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ট হয়ে কোন কোন মা সরাসরি সন্তানের নানা রকম অনিষ্ট কামনা করে বসেন। যেমন :

তুই মরিস না কেন? তুই মরলে ফকিরকে একবেলা ভরপেট খাওয়াতাম!

আল্লাহ, আমি আর পারিনা, এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও!
তুই ধ্বংস হ!
তুই জাহান্নামে যা!
তুই যদি এরকম আবার করিস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি !

এ জাতীয় বাক্য আমরা অহরহই শুনতে পাই। গর্ভধারিণী মা কখনোই তার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না। কিন্তু অসচেতনভাবে কামনা করা দুর্ঘটনাও কখনো সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই এ সময় মাকে অনেক বেশি ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। ইসলাম কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদদু'আ করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্ত এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন 'আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্তুরি। তোর উপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রসূলুল্লাহ সা: বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রসূল। তিনি (রসূলুল্লাহ সা:
) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দিবেন। (সহীহ্ মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করো না। কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু'আ করছো, তা দিনের মধ্যে ওই সময় যখন যা-ই দু'আ করা

হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ)

হাদীসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদীসটিতে এর কারণও তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, দু'আ কবুলের কিছু বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে এবং তা ঠিক ঐ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে সেই মুহূর্তে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।' (আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবী দাউদ)

নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে দু'আ করার অর্থ তো নিজেই নিজেকে হত্যার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।'

(সূরা বাকারা ২: ১৯৫)

অতএব প্রতিটি মাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে শুধু মায়েদেরই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া।

তৃতীয় অধ্যায় সন্তানের চরিত্র গঠনের উপায়

সন্তানের সুন্দর চরিত্র গঠনে বাবা-মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে প্রধান, বক্তব্যের চেয়ে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে উত্তম আদর্শ স্থাপন, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চা, এবং সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে একটি আদর্শ চরিত্র গঠন করা সম্ভব।

সন্তানের চরিত্র গঠনের উপায়

১. বাড়িতে সুন্দর ইসলামী পরিবেশ তৈরী করা।

২. সন্তানদের নিকট ইসলামকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা।

৩. আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরী করা।

৪. সন্তানের ধারণ ক্ষমতা বুঝে ধীরে ধীরে এগুতে থাকা।

৫. জোর না করা, সব আদেশ-নিষেধ একসাথে চাপিয়ে না দেয়া।

৬. সন্তান যেন দ্বীন ইসলামকে ভালবেসে গ্রহণ করে, শাস্তির ভয়ে নয়।

৭. Islam should be fun as well as compulsory.

৮. রসূল সা: ও সাহাবাদের জীবনের ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা।

৯. মা-বাবার জীবনযাপন পদ্ধতি সন্তানের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা। রোল মডেল হই সন্তানদের চোখে।

১০. তাকে শুধু ভাল হওয়ার থিওরী শিক্ষা না দিয়ে সাথে প্রাকটিক্যালও করানো।

১১. উদাহরণ সৃষ্টি করা। নিজে একটি ভাল কাজ করে তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়া।

১২. সন্তান ও স্ত্রী বা স্বামীকে সব সময় সালাম দেয়া। এছাড়া খালি বাসায় ঢুকেও সালাম দেয়া।

১৩. সবাই মিলে একসাথে ইউটিউব থেকে নিয়মিত ইসলামিক প্রোগ্রাম দেখা। এবং ঘরে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা।
১৪. সব সময় সপরিবারে ইসলামিক টিভি দেখার চেষ্টা করা।

১৫. সন্তানকে সাথে নিয়ে নিয়মিত মসজিদে যাওয়া এবং জামাতের সাথে সলাত আদায় করা।

১৬. তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেয়ার চেষ্টা করা।

১৭. প্রতি সপ্তাহে সপরিবারে নিজ ঘরে কুরআনের তাফসীর ও সহীহ হাদীস নিয়ে পারিবারিক বৈঠক করা।

১৮. তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে বই সংগ্রহ করে পড়া এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া।

১৯. সবসময় খোঁজ-খবর রাখা কোথায় কোন ইসলামিক কনফারেন্স হচ্ছে এবং সপরিবারে সেখানে যোগদান করা।

২০. বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে ইসলামের নানা বিষয়ের উপর কম্পিটিশন হয়, সন্তানদের এই সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সহযোগিতা করা।

২১. আমাদের সন্তান যদি ইসলামিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী না হয় তাহলে তাদেরকে Weekend Islamc School-এ ভর্তি করে দেয়া যেখানে তারা Islamic Studies শিখবে, নীতি-নৈতিকতা শিখবে।

শিশুর চরিত্র গঠনের কিছু কার্যকর উপায় নিচে দেওয়া হলো:

আদর্শ হওয়া: শিশুরা যা দেখে, তা-ই শেখে। তাই নিজে মিথ্যা না বলা, বড়দের সম্মান করা এবং সৎ আচরণ করার মাধ্যমে সন্তানের সামনে জীবন্ত উদাহরণ তৈরি করুন।

সঠিক ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সত্যবাদিতা, বিনয়, ক্ষমা এবং সহমর্মিতা-এই গুণগুলোর চর্চা শেখান, নিয়মিত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহিত করুন।

ইতিবাচক সঙ্গ নির্বাচন: সন্তান কার সাথে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখুন। সুস্থ এবং ভালো পরিবেশ শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সাহায্য করে।

ভুল সংশোধনে নমনীয়তা: সন্তান কোনো ভুল করলে বকাঝকা না করে, তাকে বুঝিয়ে বলুন এবং ভুলের ক্ষতিকর দিকগুলো ধরিয়ে দিন। এতে তার মাঝে অপরাধবোধ তৈরি হবে এবং সে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

দায়িত্ববোধ তৈরি: ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দিন (যেমন-নিজের খেলনা গুছিয়ে রাখা, পড়ার টেবিল পরিষ্কার করা)। এতে তার মাঝে আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ জন্মায়।

রসূল-সা: এর চরিত্রকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা:

একবার কিছু সাহাবা আয়িশা -রা: এর কাছে আসলেন এবং বললেন রসূল সা: এর চরিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। আয়িশা তাদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কি কুরআন আছে? গোটা কুরআন টাইতো আমার রসূলের চরিত্র, তিনি যখন হেঁটে যেতেন তখন মনে হতো জীবন্ত কুরআন হেঁটে যাচ্ছে।

তাই একজন মু'মিনের চরিত্র কেমন হবে তা কুরআনই বলে দিচ্ছে স্পষ্টভাবে। এজন্য আমরা কুরআন থেকে সূরা মু'মিনূনের তাফসীর পড়তে পারি এবং সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে পারি।

সন্তান প্রতিপালনে মহানবী (সা.)-এর ১০টি নির্দেশনা:

সন্তান মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। তাদের যথাযথ প্রতিপালন পিতামাতার ওপর অর্পিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মহানবী (সা.) সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এমন কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যা সন্তানের নৈতিক উৎকর্ষ, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মিক বিকাশে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। তাঁর ১০টি নির্দেশনা উপস্থাপন করা হলো:

১. বিশুদ্ধ আকিদার শিক্ষা

সন্তান প্রতিপালনে মহানবী (সা.)-এর প্রথম নির্দেশনা হলো শৈশব থেকে সন্তানের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আকিদার ভিত্তি স্থাপন করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কিশোর বয়সে মহানবী (সা.) তাকে তাওহিদ ও তাকদিরের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শৈশব থেকে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস সন্তানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে এবং হতাশা থেকে মুক্ত রাখে।

তিনি বলেছেন: "হে বালক, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শেখাব: মহান আল্লাহর বিধানের হিফাজত করবে, তিনি তোমাকে হিফাজত করবেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখবে, তাঁকে তোমার সামনে পাবে।" (সুনান তিরমিজি, হাদিস: ২৫১৬)
শৈশব থেকে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস সন্তানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে এবং হতাশা থেকে মুক্ত রাখে।
সন্তানদের দৃঢ়চেতা মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

২. নামাজের নির্দেশ:
মহানবী (সা.) শৈশব থেকে সন্তানকে ইবাদতে অভ্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে নামযের ব্যাপারে। তিনি বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে নামাজের জন্য (প্রয়োজনে) প্রহার করো।" (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫)
নামাজের প্রতি যত্নশীলতা সন্তানের জীবনে শৃঙ্খলা, আত্মিক প্রশান্তি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

৩. সমতা রক্ষা:
সন্তানদের প্রতি আচরণ ও ভালোবাসায় সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেছেন: "মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৫৮৭)

তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে নামাজের জন্য (প্রয়োজনে) প্রহার করো।

-সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫
স্নেহ, উপহার বা আচরণে পক্ষপাতিত্ব সন্তানদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, যা তাদের মানসিক বিকাশে ক্ষতিকর।

৪. দয়া ও কোমলতা:
সন্তানের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে চুমু দিতেন এবং বলেছেন: "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৯৯৭)
দয়া ও কোমলতা পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৫. উত্তম চরিত্রের শিক্ষা:
মহানবী (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ৮৯৫২)

৬. কন্যাসন্তানের প্রতি গুরুত্ব:
ইসলাম কন্যাসন্তানকে সম্মানের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামতের দিন তিনি ও আমি এমন অবস্থায় আসব।" এই বলে তিনি তাঁর আঙ্গুল একত্র করলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৩১)
কন্যাসন্তানের উত্তম প্রতিপালন জান্নাত লাভের মাধ্যম।

৭. শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ:
শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মহানবী (সা.) উৎসাহ প্রদান করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন: “হে আল্লাহ, তাকে গভীর প্রজ্ঞা ও কোরআনের গভীর রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন।" (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৬)
উৎসাহ শিশুকে আত্মবিশ্বাসী ও সফল করে তোলে।
এক যুবক অনৈতিক কাজের অনুমতি চাইলে তিনি প্রশ্ন করলেন: “তুমি কি নিজের মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?" যুবক বললেন, "না।” তিনি বললেন, "লোকেরাও তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না।"

৮. পাপ থেকে সতর্কতা:
মহানবী (সা.) প্রজ্ঞা ও কোমলতার সঙ্গে সন্তানদের পাপাচার থেকে সতর্ক করতেন। এক যুবক অনৈতিক কাজের অনুমতি চাইলে তিনি প্রশ্ন করলেন: “তুমি কি নিজের মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?" যুবক বললেন, "না।" তিনি বললেন, "লোকেরাও তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ২২২১১)
এটি সন্তানকে যুক্তি ও কোমলতার মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখার উত্তম দৃষ্টান্ত।

৯. কোরআনের প্রতি ভালোবাসা:মহানবী (সা.) সন্তানের হৃদয়ে কোরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫০২৭)
কোরআনের শিক্ষা সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করে।

১০.কল্যাণের জন্য দোয়া: সন্তানের জন্য কল্যাণকামনা করে দোয়া করা এবং তাদের ওপর বদদোয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেছেন: "তোমরা নিজেদের, সন্তান-সন্ততি, ভৃত্য বা সম্পদের ওপর বদদোয়া করো না।" (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৫৩২)।

পিতামাতার দোয়া মহান আল্লাহ কবুল করেন, যা সন্তানের জন্য নিরাপত্তা ও রহমত বয়ে আনে।

মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনাগুলো সন্তান প্রতিপালনে একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এগুলো সন্তানের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আকিদা, ইবাদতের অভ্যাস, নৈতিক শিক্ষা, সমতা ও কোমলতা প্রতিষ্ঠা করে। ফলে সন্তান দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করে।

পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানের মধ্যে আমানতদারি, সততা, বিনয় ও সৎকর্মের মতো গুণাবলি প্রতিষ্ঠা করা। এটি নিজের আচরণ বা উপদেশের মাধ্যমে সম্ভব।

সন্তানদের ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখাতে চেষ্টা করা

আমার কাছে যদি সত্য-মিথ্যার বিষয়টি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, যদি আমি নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে আপোষহীন হয়ে থাকি, যদি আমার সন্তানের উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সাথে উচ্চ নৈতিকতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে কোমর বেঁধে নামতে হবে। প্রস্তুতি নিতে হবে, নিজেকে তৈরী করতে হবে। কারণ শ্রেণীকক্ষে কেবল স্বাদহীন কিছু মালমশলা দেয়া হয়। আর ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল রেজাল্ট করার আশায় সেগুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে তা উগরে দেয়া পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ থাকে। শ্রেণীকক্ষের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি আমাকেই সন্তানের আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও ঈমানের নূর প্রবেশ করাবার জন্য বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে যদি আমার আর্থিক কিছু খরচ হয় তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

সন্তানদের অতি ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শিখানোর চেষ্টা করতে হবে। সত্য উজ্জ্বল, মিথ্যা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এটি বিভিন্ন কাজ, কথা ও উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে বলতে হবে যে, দু'জন ফিরিশতা বা লেখক আমাদের দুই কাঁধে বসে নিদ্রাহীন ও বিরতিহীনভাবে আমাদের সকল কাজ
রেকর্ড করে রাখছেন । একদিন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সে খাতা খুলে দেখাবেন আমরা কি কি কাজ করেছি। আরো বলতে হবে যে লেখকগণ সম্মানিত ও সৎ। বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু লেখার ক্ষমতা তাদের নেই । অতএব আমরা যা কিছুই করি না কেন ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি যাচাই করে দেখা উচিত, অন্যায় হতে বিরত থাকা উচিত।

১. আদব ও শিষ্টাচার শেখানোর কার্যকরী ধাপ

নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন (Role Modeling): শিশুরা যা দেখে, তা-ই শেখে। তাই নিজে সত্য কথা বলুন, নম্রভাবে কথা বলুন এবং বড়দের সম্মান করুন।

ধীরে ধীরে ও সুন্দরভাবে বোঝানো:
কোনো ভুল করলে বকা না দিয়ে, নরম ভাষায় এবং ভালোবাসার সাথে সঠিক নিয়মটি বুঝিয়ে বলুন।

নিয়মিত দু'আ ও আমল শেখানো:
প্রতিদিনের ছোট ছোট সুন্নাহ ও দোয়া শেখান। যেমন: ঘরে প্রবেশের ও বের হওয়ার দোয়া, ঘুমানোর দোয়া, এবং খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

২. দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইসলামী আদব

সালাম দেওয়া: কারো সাথে দেখা হলে হাসিমুখে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা এবং সালামের উত্তর দেওয়া।

খাওয়ার আদব: ডান হাতে খাওয়া, নিজের সামনে থেকে খাওয়া এবং খাবার অপচয় না করা।

কথা বলার আদব: বড়দের কথা
মনোযোগ দিয়ে শোনা, চেঁচিয়ে বা কর্কশ ভাষায় কথা না বলা এবং সত্য কথা বলা।

অনুমতি নেওয়ার আদব: অন্যের কক্ষে বা ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া এবং দরজা নক করা।

আপনার সন্তানকে যে ৩ বিষয়ে শিক্ষা দিতে বলেছেন রাসূল (সাঃ):

বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসন্তানের ওপর বহুমুখী দায়িত্ব অর্পিত হয়, যাকে শরী'আতের পরিভাষায় বলা হয় তাকলীফ। তাকলীফ পর্যায়ে উপনীত হয়ে যেন সে যথাযথ আপন কর্তব্য পালন করতে পারে, এজন্য শিশুর মধ্যে যখন থেকেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধোদয় সূচিত হবে, জ্ঞান প্রথম আলোর উন্মেষ ঘটতে শুরু করবে, তখন থেকেই শুরু করতে হবে তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

ক. ঈমানের বিষয়সমূহ শিক্ষা:

আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশতা, নবী-রাসূল, তাকদীর, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য অপরিহার্য অদৃশ্য বিষয়সংক্রান্ত বিশ্বাস।

হাদীসে রয়েছে,

افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله«.

"তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শিক্ষা দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

খ. আরকানুল ইসলাম:

তথা সালাত, সাওম ইত্যাদির প্রশিক্ষণ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا » . وَهُمْ أَبْنَاء عشر سنينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"সাত বছরে পর্দাপণ করলেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাত পড়ার নির্দেশ দাও, দশ বছরে পর্দাপণ করলে (তখনও যদি সালাত পড়ার অভ্যাস না হয়ে থাকে

তবে) তাদেরকে সালাত তরক করার জন্য দৈহিক শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"

সালাত সম্পর্কিত নির্দেশ অন্যান্য আরকানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

গ. শরী'আতের বিধি-বিধান:

তথা আক্বীদাহ, ইবাদাত, আখলাক, সর্বাত্মক ব্যবস্থাপনা ও বিধি-বিধান। এক কথায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন সম্পর্কে তাদের মধ্যে মৌলিক ধারণা রোপন করা।

ঘ. কুরআন, সুন্নাহ, সীরাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান: আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

أدبوا أولادكم على خِصَالٍ ثلاث : عَلَى حُبِّ نَبِيِّكُمْ ، وَحُبِّ أَهْلِ» بَيْتِهِ ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْقُرآنِ ، فَإِنْ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظل الله يَوْمَ لا ظل إلا ظِلَّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দাও। (ক) তোমাদের নবীর প্রতি ভালোবাসা (খ) তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এবং (গ) কুরআন তিলাওয়াত।

কুরআনের ধারকরা নবী-রাসুল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে আল্লাহর 'আরশের ছায়াতলে থাকবে, যখন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।"

একদা উমর (রাঃ) এর কাছে এসে জনৈক ব্যক্তি নিজের সন্তানের অবাধ্যাচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ওমর অভিযুক্ত সন্তানকে পিতার সাথে অসদাচরণের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সন্তান তখন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, সন্তানের কি পিতার

উপর কোনো হক আছে? উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। সে বলল, তাহলে তা কী?

উমর (রাঃ) বললেন, পিতা তার জন্য সৎ আদর্শ নারীকে মাতা হিসেবে গ্রহণ করবে, তার জন্য একটা সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে। তখন সন্তান বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার পিতা ওগুলোতে একটিও করে নি। আমার মা হচ্ছেন ক্রীতদাসী। এক সময় মূর্তিপূজারী ছিলেন, আমার নাম রেখেছে জু'লান (অর্থাৎ গোবরে পোকা) আর আমার বাবা আমাকে কুরআনের একটি বর্ণও শিক্ষা দেন নি।

উমর (রাঃ) তখন পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এসেছ সন্তানের অসদাচরণের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। আরে তুমি তো তার প্রতি আগেই অবিচার ও অসদাচরণ করেছ।

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা আমাদের সন্তানদের রাসূলের যুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষা দিতাম, যেমনিভাবে তাদেরকে আমরা কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতাম।

ইমাম গাযালী রহ. তাঁর ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনের মধ্যে শিশুকে কুরআনুল কারীম, হাদীস শরীফ, পূণ্যবানদের জীবনকথা ও তারপর দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন।

ঙ. তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চেতনা সঞ্চার করা: সন্তানের মধ্যে আল্লাহর ভয় প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই বলতে হবে তুমি যা কর এবং বল প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে, দিনের আলোতে কিংবা রাতের অন্ধকারে, জলে কিংবা স্থলে সকল জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পর্যবেক্ষণ করেন। অতএব, আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোনো অপরাধ করলেও আল্লাহ তোমার কৃতকর্মের হিসাব অবশ্যই নেবেন। তোমাকে তাই সব সময় আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর পথে চলতে হবে।

সন্তানের মধ্যে খোদাভীতির এই চেতনা সঞ্চারিত করতে পারলে সে আর কুপথে পা বাড়াবে না।

চ. চারিত্রিক প্রশিক্ষণ:

চারিত্রিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব প্রসঙ্গে নবী করিম (সাঃ) বলেন,

.ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن

"উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদানের চেয়ে বড় দান কোনো পিতা তার সন্তানের জন্য করতে পারে নি।"

» .أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم«

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের ভালোবাসা দাও এবং তাদেরকে সর্বোত্তম শিষ্টাচারিতা ও নৈতিকতা শিক্ষা দাও।"

أن يحسن اسمه ويحسن أدبه«

"পিতার ওপর সন্তানের হক হলো, তার জন্য সুন্দর একটা নাম রাখবে এবং তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও চরিত্রগুণে গড়ে তুলবে।"

.لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع«

"সন্তানকে একটা উত্তম শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর পথে এক সা' পরিমাণ বস্তু সদকা করার চেয়েও উত্তম।"

ইসলামে সঠিক সময়ে সন্তানকে বিয়ে করানোর গুরুত্ব:

যথাযথ সময়ে বিবাহ না দেওয়া বা বিলম্বিত করার ফলে তরুণ-তরুণীরা মানসিক হতাশা, অনৈতিক সম্পর্ক (যিনা) এবং চারিত্রিক স্খলনে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ইসলামে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহে বিলম্ব করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো সঠিক সময়ে শরীয়তসম্মত উপায়ে সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা করা।

সঠিক সময়ে বিবাহ না দেওয়ার নেতিবাচক প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

দেরিতে বিবাহ দেওয়ার প্রভাব:

ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়: বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলে যুবক-যুবতীদের মাঝে চারিত্রিক স্খলন, পর্নোগ্রাফি আসক্তি, এবং হারাম বা অবৈধ সম্পর্কের প্রবণতা বেড়ে যায়।

মানসিক ও শারীরিক জটিলতা:
অবিবাহিত থাকার কারণে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, ও মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা: ইসলামে বলা হয়েছে, সামর্থ্যবানদের সঠিক সময়ে বিয়ে না দিলে সমাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। মুসলিম বাংলা

সন্তান জন্মদানে জটিলতা: চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, অতিরিক্ত দেরিতে বিয়ে হলে নারীদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন শারীরিক ঝুঁকি বাড়ে।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব:

চরিত্র রক্ষা: রাসূলুল্লাহ (সা.) সামর্থ্যবান যুবকদের বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ এটি দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।

দ্বীন পূর্ণতা: বিবাহকে দ্বীনের অর্ধেক অংশ বলা হয়েছে। জীবনের একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হলে বিয়ে করা সুন্নত।

দেরিতে বিয়ের সামাজিক কারণ:
আমাদের সমাজে সাধারণত উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠা, অতিরিক্ত যৌতুকের দাবি, এবং বিয়েতে অহেতুক শর্ত বা জটিলতা সৃষ্টির কারণে বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়।

এছাড়া অভিভাবকদের অতিরিক্ত picky বা খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণেও অনেক সময় উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পাওয়া যায় না।

আমাদের করণীয়:
সন্তান বা পরিবারের কারো বিয়ের বয়স হয়ে গেলে অযথা দেরি না করে বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। সন্তানরা যদি বিয়ের উপযুক্ত হয়, তবে পিতা-মাতার উচিত দ্রুত তাদের চারিত্রিক ও দ্বীনদারি বিবেচনা করে বিয়ে দেওয়া।

আজ সামাজিক জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ একটি সমস্যা হলো প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে না দেওয়া। কেননা ঘরে ঘরে প্রাপ্ত বয়স্ক যুবতিরা বিয়ের অপেক্ষার প্রহর গুণছে।
তোমরা যেনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। (সুরা বনি ইসরাঈল: ৩২)

অন্যদিকে অবিবাহিত যুবকরা বিয়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। তারা বিয়ের পথ খুঁজছে, অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই দুশ্রেণির মাঝে এক বড়

প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে আছে, যে প্রতিবন্ধক তাদেরকে হালাল মিলনের পথে বাধা দিচ্ছে।

বর্তমানে দেখা যায়. অভিভাবকরা ছেলে-মেয়ের মনের আশা-আকাংখা, ভালোলাগাটা বুঝতে চেষ্টা করছে না। কিংবা বুঝলেও না বোঝার ভান করে থাকেন। ছেলে-মেয়ে কেমন পাত্র-পাত্রী পছন্দ করে তাও একটু লক্ষ্য করেন না।

বরং নিজেদের মনগড়া কাজ করে যাচ্ছেন। এর দ্বারা ছেলে মেয়ের ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না আবার নিজ আকাংখাও মিটে না। যার ফলে বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

অপর দিকে অভিভাবকদের মন মতো না মিলায় এবং ছেলে-মেয়ের ইচ্ছার প্রতিফলন না হওয়ায় তাদের সামনে নতুন অবয়বে ধরা দেয় যেনা-ব্যভিচারের নোংরা পথ।

অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন, তোমরা যেনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। (সুরা বানি ইসরাঈল: ৩২

সমাজের এই যুবক-যুবতিদের তারুণ্যদীপ্ত জীবনকে হালাল পথ ছেড়ে দিয়ে হারাম পথকে গ্রহণ করার পেছনে অনেক অংশে অভিভাবকরা দায়ী। একারনে আজকের যুবক-যুবতিরা জৈবিক চাহিদা মেটাতে নানা পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

কেননা সেখানে তাদেরকে কোন বাধা-বিপত্তির ধার ধারতে হয় না। তরুণ-তরুণীদের ওই পথে যাওয়ার পেছনে সম্মানিত বাবা-মায়েরা সব থেকে বেশি দায়ী, কেননা যারা এখনও উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, বর্তমানে ধ্বংসকারী ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলছে।

যা আর্দশ নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র, সম্মান সবকিছু নিঃশেষ করে দিচ্ছে । এর কোনো প্রতিষেধক নেই এবং মুক্তির কোনো উপায়ও নেই। তবে একটি মাত্র পথ খোলা, সেটা হচ্ছে বিয়ে।

বিচক্ষণ অভিভাবকদের জন্য উচিত হলো- তাদের জন্য শরিয়তসম্মত পন্থায় দ্বীনদারি ও নীতি-নৈতিকতা এবং চারিত্রকতা বিবেচনা করে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আর বিয়ে-শাদীতে যে ব্যক্তি বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা বিয়ে-শাদীতে বিভিন্নশর্ত আরোপ করে জটিলতা সৃষ্টি করে, এসবের জন্য তাদের জবাবদিহিতার সম্মুখিন হতে হবে।

আর এই অবহেলার কারণে যদি যুবক-যুবতিদের সঠিক সময় বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহলে এই যুবক যুবতিরা তাদের চাহিদা নিবারনের জন্য যত প্রকার অন্যায় কাজ করবে, তার ইহকালীন ও পরকালীন সকল পাপের একাংশ অবশ্যই সেই অভিভাবকদেরকে নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল অভিভাবকদেরকে এ মহান দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

উপসংহার :

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক কেবল রক্তের বাঁধনেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি পারস্পরিক স্নেহ, ত্যাগ এবং কর্তব্যের এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনে উভয়ের ভূমিকাই অপরিসীম। শৈশবে পিতামাতা যেমন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন, তেমনি পিতামাতার বার্ধক্যে সন্তানের দায়িত্ব হলো তাঁদের ছায়ার মতো আগলে রাখা এবং সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সেবা নিশ্চিত করা। বর্তমান আধুনিক যুগে সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে এই পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কোনো সন্তান যেন তাঁর পিতামাতাকে বোঝা না মনে করে এবং কোনো পিতামাতা যেন সন্তানের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত না করেন। এই দুই পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি বজায় থাকে এবং একটি সুন্দর, সহানুভূতিশীল ও আদর্শ সমাজ
বিনির্মাণ সম্ভব হয়।

তথ্য সূত্র /রেফারেন্স

১,আল কুরআন,
২,আল হাদীস,
৩,পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য (আল্লামা তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহু),
৪,মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার (আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী),
৫,পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য (মুহাম্মদ আব্দুর রহীম),
৬,প্যারেন্টিং (আমির জামান ও নাজমা জামান),
৭,মাসিক আল কাওসার পত্রিকা